বেলাভূমি

বেলাভূমি

শক্তিপদ রাজগুরু

সাহিত্যলোক
৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলকাতা ৬

এসপ্লানেডের ঘুম সবে ভাঙছে।

কর্মব্যস্ত জনবহুল পথ কার্জনপার্ক-এর রূপই আলাদা। পথের এদিক-ওদিকে দু-একটা অস্থায়ী দোকানে চায়ের জল চেপেছে, ওদিকে স্টেট বাসের দূরপাল্লার যাত্রীরা কিছু এসেছে, তাদের জটলা এখান-ওখানে। দু-চারটে ফাঁকা ট্রাম বাস সবে যাতায়াত সুরু করেছে।

এদিকে দীঘাগামী বাসটা দাঁড়ানো।

দু-চারজন যাত্রী এসে উঠছে মালপত্র বেডিং, সুটকেশ, হোল্ডঅল নিয়ে।

কলকাতার কর্মব্যস্ত জীবন থেকে কয়েকদিনের জন্য বাইরে সবুজ ঝাউবন, সমুদ্র দেখতে যাচ্ছে তারা। এই ক'দিন সমরেরও ছুটি।

মেসে সকালে উঠেই প্রাতঃকৃত্য সারার জন্য লাইন দিয়ে কোনরকমে সে সব সমাধা করে মেসের বারোয়ারী চাকর গোবিন্দকে ডাকাডাকি করে খুঁজে পেতে চা আর বিস্কুট-এর জন্য তোসামোদ করতে হবে না। চা বিস্কুট খেয়ে মেসের খবরের কাগজ নিয়ে টানাটানি করে কিছুক্ষণ অন্যাদিন।

ওদিকে হলধরবাবুর ঘর থেকে তখন তারস্বরে অংবং-এর শব্দ ভেসে

আসে, ভদ্রলোক ধর্ম টর্ম করেন ; গীত চণ্ডীমাহাত্ম্য একযোগে আওড়ে, বাতাসা জল সেবন করে হুঙ্কার ছাড়েন।

—ভাত হোল ঠাকুর ?

ওদিকে তখন চৌবাচ্চার ধারে স্নানার্থীদের ভিড় জমেছে। মগ্-বালতিতে করে উঠানের খোলা চৌবাচ্চায় রাতভোর জমা ঠাণ্ডা জল ঢালছে বাবুরা।

রান্নাঘরে ঠাকুর তখন ব্যস্ত। গোবিন্দ পাশেই খাবার ঘরে ময়লা জীর্ণ আসনগুলো পাতছে, অবশ্য তার আগেই বাবুরা স্নান সেরে চোবানো পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে মিউজিক্যাল চেয়ার রেস স্থরু করেছে ওই আসন দখল করার জন্য।

সমরও সেই খেলায় যোগ দিয়ে কোনমতে আসন পেতে বসে পড়ে।

ঝোল-এর টেম্পারেচার তখনও স্ফুটনাঙ্ক ছুঁয়ে আছে। দু-চার টুকরো আলু আর একপিস পাতলা মাছের টুকরো চেয়ে আছে, ভাত-এর ধোঁয়া উঠছে তৎসহ একটা পাঁচ মিশলী তরকারীর ঘ্যাট।

খাওয়া নয়, কোনরকমে গর্ত বোজানো যাকে বলে সেই ভাবে কিছু গোগ্রাসে গিলে উঠতে হয়, ভালো করে চিবোবার সময় নেই। কারণ পরের ব্যাচ-এর বাবুরা তখন তাড়া দেয়— লেট হয়ে যাবে হে। হাত চালিয়ে নাও ভায়া।

সমরের মাঝে মাঝে বিরক্তি আসে এই একঘেয়ে জীবনে। খাওয়ার পরই দৌড়! অফিস সেই বি-বা-দী বাগ্ এলাকায়, বেশ কিছুটা দূর। তবু অনেকে ওই জনসমুদ্রে মিশে ভেসে গিয়ে হাজির হয় সেখানে।

সমর ট্রামে বাসে ওঠার চেষ্টা করে। কিন্তু ট্রাপিজ না হয় প্যার‍্যালালবার-এর খেলা জানা পাকা লোকের দরকার তখন ট্রামে উঠতে গেলে। কখনও স্রেফ দুহাতের উপর ভর দিয়ে হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলে যেতে হয়, কখনও ভিড়ের চাপে যেন ভাতই উঠে আসবে গলা দিয়ে তাই মনে হয়।

অফিসে পৌঁছে সেই কাজের চাপ, কর্তাদের মন্তব্য সহ ফাইলের হিসেব আর লাখ লাখ টাকার অঙ্ক মেলানো। কখন বৈকাল হয় জানে না।

বের হয়ে আবার ফ্রি ষ্টাইল কুস্তির মহড়া দিয়ে ট্রামে ওঠা-নামা করে মেসের কোটরে ফেরা। তখন ক্লান্ত মানুষগুলো ফিরছে আবার একে একে।

আর কোন আকর্ষণ নেই, একঘেয়ে জীবনের ক্লান্তি অন্ধকারে নেমে আসে তাদের জীবনেও।

হঠাৎ সেই নিঃসঙ্গ অন্ধকার জীবনের আঙ্গিনায় যেন এক ঝলক আলো এসে পড়েছে। কিছুদিন থেকেই ভাবছিল কথাটা। সেদিন কি খেয়ালবশে টুরিষ্ট ব্যুরো অফিসের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দোতলায় উঠে যায়। দেওয়ালে টাঙ্গানো বিভিন্ন জায়গার ছবি রয়েছে।

কালিম্পং দার্জিলিং-এর পাহাড় অঞ্চল, বোলপুরের শান্তিনিকেতন, দীঘার সমুদ্র তীরের ছবিগুলো দেখছে। কলকাতা থেকে সেও যেন অমনি কোথায় হারিয়ে গেছে কয়েক দিনের জন্য।

সমর ভালো চাকরী করে। ইদানিং ব্যাঙ্কের চাকরীতে দুটো বিভাগীয় পরীক্ষা দিয়ে উপরের থাকে উঠেছে, কিছু টাকা পাঠায় বহরমপুরের বাড়িতে। সেই টাকা পাঠিয়েই কর্তব্য সমাধা করে ও তার নিজের জন্য যা থাকে তাতে ওই মেসে কেন ছোট্ট একটা বাসা করেও থাকা যায়।

কিন্তু একা মানুষ তাই ওপথে যায় নি, মেসেই রয়ে গেছে। কিছুটা কষ্ট, অসুবিধা হয় কিন্তু খাবাব, থাকার সমস্যাটা তত তীব্র হয়ে ওঠেনি। তাই সেই অসুবিধাটাকে ও মেনে নিয়েই চলেছে।

সমর চেয়ে থাকে দীঘার সমুদ্রতীরের ছবিটার দিকে। সমুদ্র এর আগে সে দেখেনি। বহরমপুরে মানুষ, লেখাপড়াও সেইখানে। বিশেষ বাইরে কোথাও যায়নি। বহরমপুর আর কলকাতাই তাব জগৎ, তাই দীঘার সমুদ্র, ঝাউবন তার চোখে কি স্বপ্ন আনে।

সৈকতাবাসে থাকার ব্যবস্থা করে ফেলে তখনিই। মনটাকে তৈরি করেছে, এই একঘেয়ে জীবন থেকে ক'দিন পালাবে ওই সবুজ সমুদ্রের ধারে।

বাসটায় লোকজন উঠে পড়েছে মালপত্র নিয়ে, সূর্যের আলোর আভাষ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে কার্জনপার্ক-ধার-পাশের রাস্তায় দোকানপত্র বসছে।

হর্ণের শব্দে চমক ভাঙ্গে সমরের।

কনডাকটার বলে— উঠুন স্যার, বাস ছাড়বো এবার।

সমর এতক্ষণ নীচে দাঁড়িয়ে ছিল, দেখছিল কলকাতার এই কেন্দ্রের ঘুমজড়ানো রূপটাকে। তাই বাসের ভিতরেব যাত্রীদেব দিকে বিশেষ নজর করেনি।

হাওড়া ব্রিজ ছাড়িয়ে হাওড়ার মধ্য দিয়ে বাসটা চলেছে সহব ছাড়িয়ে দূরের দিকে। এবার বাস-এব যাত্রীদেব দিকে নজব দিতে পারে সে।

সব সিটই ভর্তি রকমারী যাত্রীদেব ভিড়ে। বাস তখন বোম্বাই রোড ধরে আন্দুল ছাড়িয়ে চলেছে। বোম্বাই রোড ধরে যাত্রী বোঝাই বাসগুলো সহরের দিকে আসছে। মিষ্টিব আকষণে যেন পিপড়েব দল ছুটে আসছে সহরের দিকে

আজ সমরের সকালে উঠে গরম ঝোল ভাত দিয়ে গর্ত বোঝাই করে ট্রামে বাসে ঝুলতে ঝুলতে অফিসে যেতে হবেনা, লাখ টাকার অঙ্কের হিসাবও মেলাতে হবেনা।

আজ তার ছুটি। ছুদিকে সোনালী ধান ক্ষেত, আলোভরা জগৎ-এ তার জন্য রয়েছে ছুটির নিমন্ত্রণ। বাঁশ-বন, পানা-ডোবা, নারকেল পাতায় হাওয়ার নাচন আজ তার চোখে কি যাছু আনে। তার মনে আনে মুক্তির সুর।

হঠাৎ কি অজানা খুশির আবেশ জাগে সারা মনে।

এই বাসের সকলের মনেই যেন সেই মুক্তির স্বপ্ন।

কাজল মুগ্ধ বিস্মিত চাহনি মেলে দেখছে বাইরের জগৎকে। কলকাতার কোন গলির গলি তস্য গলির ভিতরে একতলা একটা জরাজীর্ণ বাড়ির ছুখানা ঘরে সে বড় হয়েছে।

তার বাবা শশীবাবু কোন মাড়োয়ারির গদিতে খাতা লিখে সেই মাড়োয়ার নন্দনের ছুনম্বরী ব্যবসার লাখ বেলাখ টাকাকে অন্ধকারে পাচার করে মাসের শেষে নিজে মাত্র শ'পাঁচেক টাকা নিয়ে অন্ধকার ঘরে ফেরে। পাঁচটি প্রাণীর সংসার। মেয়ের পড়াশোনার খরচা, দিন চালানোর খরচ যোগাতে হিমসিম খেয়ে যায়। ছেলেরাও ছোট।

কাজল তাই মেয়ে হয়েও স্বপ্ন দেখে বাবার পাশে দাঁড়াবে। তাই স্কুলফাইন্যাল পাশ করে এখানে ওখানে চাকরীর চেষ্টা করছে। টাইপ জানা থাকলে চাকরী মেলে। তাই টাইপও শিখছে। কোন রকমে ছু'-একটা টুইশানী করে তার হাতখর্চা, টাইপ স্কুলের মাইনে যোগায়।

রমেনের সঙ্গে বাইরে আসার কথা ভাবতেই পারেনি সে। দীঘা সমুদ্রের ধার, ঝাউবনে ক'দিন ওই অভাবের জীবন আর হতাশার অন্ধকার থেকে সরে থাকতে চেয়েছিল সে সারা মন দিয়ে, তবু মনে মনে একটা ভয়ই জমেছিল।

রমেনকে চিনেছে সে অল্প কিছুদিন। ওই পাড়াতেই থাকে। তাদের বাড়িও আসে, বাবা-মাও রমেনকে প্রশ্রয় দেয় সেটা কাজলের চোখ এড়ায় নি।

কাজলও রমেনের কাছে কিছুটা কৃতজ্ঞ। তাই সেদিন দীঘা আসার কথা শুনে একটু অবাক হয়েছিল। রমেন অবশ্য বলেছিল কাজলের বাবা মাকে অন্য কথা।

রমেন বলে— মেদিনীপুরে আমার বাড়িতে বোনের বিয়ে, মা বাবা বার বার বলেছে আপনাদের নিয়ে যেতে। কেউ যাবেন না, বাড়ি গিয়ে কি বলবো ওদের? মা তো বলবে মাসীমা মেসোমশাই কেউ এলনা? আমার মুখ থাকবে না।

কাজলের মা কি ভেবে বলে— ঠিক আছে। কাজল তো বাইরে যায়নি ও বরং বিয়ে বাড়ি যাক। ছু'তিনদিন বইতো নয়।

রমেন মনে মনে খুশিই হয়েছে এ প্রস্তাবে। বলেচে— না, না, বিয়ের পরদিন বর-কনে বিদায় হবে বৈকালে, আমরা তার পরদিনই ফিরে আসবো। নাহয় তার পরের দিনই। এই তো দরজার কাছেই

মেদিনীপুর, দূর কোথায় !

কাজলও বিয়ে বাড়ি যাবে বাইরে, এতে খুশিই হয়েছিল।

তারপর বাসে উঠে খবরটা শুনে চমকে ওঠে কাজল। রমেনকে বলে— সে সেকি ! বাড়িতে মিছে কথা বল্লে ?

হাসে রমেন—ওসব বলতে হয়, বিয়ে বাড়ী না বল্লে তোমাকে আসতে দিত ?

কাজল-এর চোখে তবু অজানা ভয়ের হয়তো কিছুটা কৌতুহলের ছায়া ফুটে ওঠে। বলে সে— পরে যদি জানতে পারে ?

রমেন বলে— আরে বাবা ! কাকপক্ষীতেও জানবে না। আর রমেন কারোও পরোয়া করে না। বুঝলে, চলো দেখবে কি ফাইন জায়গা। সমুদ্র ঝাউবন, মন ভরে যাবে।

ওরা বের হয়েছে দীঘার দিকে।

কাজল-এর ক্রমশঃ সেই ভাবনাগুলো কেটে গেছে বাইরের সুন্দর সবুজ জগৎ নদী গ্রামসীমা দেখে। কলকাতার ঘুপচি অন্ধকার ঘরের হতাশা ভরা জীবনটাকে দুদিনের জন্য ভুলে সে এই নতুন পাওয়ার আনন্দটুকুকে উপভোগ করতে চায়।

কাজলের চুল উড়ে পড়ে মুখে, খুশির আবেশ ওর দুচোখের তারায়। উছল কণ্ঠে বলে— কি সুন্দর না ? ছাখো কি বিরাট নদী, নৌকা চলেছে পালতুলে !

রমেন দেখছে ওকে। তার লম্বা চুলগুলো উড়ছে, মুখে কিং সাইজ সিগারেট, পরণে সার্ট-প্যাণ্ট, কোমরে চওড়া চামড়ার বেল্ট, রমেন-এর পাশে কাজলের মত শান্ত মেয়েটিকে যেন বেমানান ঠেকে।

রমেন-এর কাছে ওই দৃশ্যটৃশ্য তেমন কিছুই নয়। কাজলকে সে কাছে পেয়েছে, কৌশলে এবার তাকে হাতে আনবে, পাক্‌পাড়ার রমু তাই নিয়েই স্বপ্ন দেখত, কি এক নোতুন স্বপ্ন !

কাজল তখন ওই সুন্দর জগতের দিকে চেয়ে যেন কোথায় দূরে হারিয়ে গেছে মুক্তির আনন্দে। তার ছোট ঘুপচি ঘরের পরিধিটা আজ অনেক বেড়ে গেছে, প্রসারিত হয়েছে দূর দিক্‌চক্রবালরেখা অবধি।

বাসটা ছুটে চলেছে অন্য গাড়িদের ওভারটেক করে।

এই বাসে সীমা আর নিমাইও চলেছে, ক'দিন হল বিয়ে হয়েছে তাদের। নিমাইকে যেন এখনও ঠিক চেনেনি, তার মন জুড়ে ছিল অন্য একজনের ঠাঁই। বিজন-এর সঙ্গেই ছিল তার দীর্ঘদিনের পরিচয়।

তাদের বাড়ির একটু দূরেই বিজনদের বাড়ি। দুজনে একসঙ্গে কলেজে পড়তো, কলেজের ক্লাশ কামাই করে পালাতো দুজনে, কোনদিন বোটানিক গার্ডেনের সবুজে, কোনদিন সিনেমায়, নাহয় পড়ন্ত বেলায় হারিয়ে যেতো গঙ্গার বুকে।

ভয় করতো সীমার— যদি কোথাও ভেসে যাই?

বিজন বলে—সমুদ্রে গিয়ে পড়বো। নীল সমুদ্র, ইয়া বড় বড় ঢেউ।

—ওমা! সীমার ডাগর চোখে নামতো অজানা ভয়ের ছায়া। নৌকার দুলুনিতেও ভয় আসে তার, বিজনের হাতটা শক্ত করে ধরতো।

হাসে বিজন— কি ভীতু তুমি? দীঘার সমুদ্র দেখলে ভয়ই থাকবে না। ভালো লাগবে, সুন্দর রূপালি বালুচর, সবুজ ঝাউবন, গাংচিলের দল ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে। সূর্যোদয় দেখলে মন ভরে যাবে।

সীমা অবাক হয়ে স্বপ্ন দেখতো সেই জগতের। তার মনে হতো অজানা কোন বালুচরে, অমনি সবুজ ঝাউবনে সে কোথায় হারিয়ে গেছে. সে আর বিজন।

বিজন বলে— একবার তোমাকে নিয়ে যাবো দীঘায়।

সীমার কথায় ভয়ের সুর জাগে।

—ওমা! সেখানে কি করে যাবো তোমার সঙ্গে?

—কেন বাসে করে? বিজন জবাব দেয় সহজ সুরে।

হাসে সীমা— ওমা! আমি আইবুড়ো মেয়ে তোমার সঙ্গে যাবো কি করে? বাড়িতে জানলে রক্ষে থাকবে?

বিজন-এর হাতখানা ওর হাতে।

বিজন এবার ভালোভাবে বি. এ. পাশ করেছে, চাকরীর চেষ্টাও করছে। মনে হয় কোন সরকারী চাকরীও পেয়ে যাবে। বিজন বলে। —এই কথা? রক্ষে যাতে থাকে তার ব্যবস্থাই করবো। চাকরী হয়ে

যাক তারপর।

সীমা কৌতুক ভরে শুধায়—তারপর কি করবো মশাই?

বিজন সীমাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে—কি করবে? মানে তোমার বাবাকে গিয়ে সটান বলবো আপনার মেয়েকে ভালোবাসি, তাকে বিয়ে করতে চাই।

—ধ্যাৎ! বেহায়া কোথাকার।

সীমার দুচোখে কি অফুরাণ তৃপ্তির আবেশ, নিজেকে বিজনের নিবিড় বাঁধনে ধরা দিয়ে সেও অমনি একটি স্বপ্ন দেখে, দুজনে ঘর বাঁধার স্বপ্ন! সন্ধ্যা নামছে, গঙ্গার বুকে আকাশের রং মুছে মুছে সন্ধ্যার আবেশ নামে।

সীমাও অমনি একটি স্বপ্ন দেখে।

—এ্যাই। নিমাই এর ডাকে চমকে ওঠে সীমা। মনে হয় সেই নৌকাতে চলেছে তারা, সে আর বিজন, বিজনের ডাকে চাইল।

চেয়েই চমকে ওঠে সীমা। বিজন নয়, একে যেন ঠিক চেনে না, মাত্র চার-পাঁচদিনের পরিচয়েই নিমাই তার সব কিছুরই জিম্মাদার হয়ে গেছে। তাকে নিয়ে বিজন দীঘা আসতে পারে নি, এতদিনের নিবিড় পরিচয়েও তার সেই অধিকার ছিল না, কিন্তু ক'দিনের পরিচয়ে নিমাই সেই অধিকার পেয়ে গেছে জোর করেই। সীমার প্রকাশ্য প্রতিবাদ করারও কোন অধিকার নেই।

সীমা যেন অচেনা একজনের হাতে বন্দী হয়ে চলেছে অজানা এক জগতে।

নিমাই শুধোয়— চা টা খাবে তো? সকালে একরকম না খেয়েই বের হয়েছো বাড়ি থেকে।

সীমা কোনরকমে জানায়— পরে খাবো।

নিমাই দেখেছে সীমাকে। সুন্দরীই বলা চলে তাকে। দামী শাড়ি, চোখেমুখে সলজ্জভাব তাকে যেন একটা স্বাতন্ত্র এনে দিয়েছে বাসের অন্য মেয়েদের মধ্যে।

নোতুন বিয়ে হওয়া মেয়েদের সহজেই চেনা যায়। ওদের মুখেচোখে সলজ্জভাবটুকু, ভীত চকিত চাহনি, মনের আশা নিরাশার দোলা মুখেও ফুটে ওঠে।

ব্যাপারটা ওদিকে মিনতির নজর এড়ায় নি। মাকে নিয়ে মিনতিও ক'দিনের জন্য চলেছে দীঘায় বেড়াতে। ভবতারিণী অবশ্য যেতে চায় নি। বয়স হয়েছে তার। বাতের ধাত, কোন রকমে কলকাতার বাসায় টুকটাক কাজ নিয়ে থাকে মেয়ে মিনতিকে অবলম্বন করে।

মিনতি কোন একটা অফিসে চাকরী করে। ভবতারিণী একটু সেকেলে ধরণের মানুষ। এককালে স্বামীর সংসারে সেই-ই ছিল সর্বে-সর্বা। মিনতি তখন স্কুলে পড়ে।

ভবতারিণীর জীবনে তখনই বিপর্যয় আসে। তার স্বামী ভূষণবাবু মারা গেলেন মাত্র ক'দিনের জ্বরে। হঠাৎ যে এমনি একটা সর্বনাশ ঘনিয়ে আসবে তা ভাবতে পারে নি ভবতারিণী, কিন্তু ঘটে গেল সেইটাই।

তবু ভবতারিণী কলকাতার বাড়ির নীচের ফ্ল্যাটটা ভাড়া দিয়ে এক-মাত্র মেয়েকে নিয়েই রইলেন। মিনতি পড়াশুনাতেও ভালো। ভালো-ভাবে পাশ করে কলেজে ভর্তি হ'ল। ভবতারিণী বলে— এবার তোর বিয়ে থা দিয়ে দায়মুক্ত হই বাছা।

মিনতির স্বপ্ন সে এম. এ পাশ করে রিসার্চ করবে, কোন কলেজে পড়াবে। পড়াশোনার মধ্যেই থাকতে চায় সে, নিজেকে এত সহজে সেই ঘরের বৌ করে কোন বদ্ধ চৌহুদ্দীর এল্যাকায় আটকে রাখতে পারবে না।

মাকে বলে— এতই বোঝা হয়ে আছি তোমার ?

হাসে ভবতারিণী— না রে। তবু মায়ের কর্তব্য তো আছে।

মিনতি শোনায়,— আর আমার কর্তব্য বুঝি নেই ? তোমাকে একা ফেলে চলে যাবো কোথায় নিজের ঘরে ?

মা চাইল মেয়ের দিকে।

ভবতারিণী একাই পড়ে যাবে। তবু মায়ের মন, মিনতি বলে।

—ওসব কথা পরে ভাবা যাবে। এখন পড়তে দাওদিকি! সামনে পরীক্ষা, আর এ সময় কিনা বিয়ের ঘটকালি করতে এলো।

মিনতি ভালোভাবে পাশ করে, চাকরীর পরীক্ষাটাও দিয়েছিল কি ঝোঁকে পড়ে, চাকরীটাও হয়ে যায়।

ভবতারিণী অবাক হয়— চাকরী করবি তুই?

মিনতি বলে— কেন চাকরী কি একা তোমার মেয়েই করছে মা? দ্যাখো গে, কত মেয়ে এখন চাকরী করছে অফিস কাছারিতে। তাছাড়া বসে বসে কি করবো? মাস গেলে টাকাটা তো আসবে। বসে খেতে গেলে রাজার ধনও কুলোয় না। কতদিন আর চলবে আমাদের?

কথাটা সত্যিই।

ভবতারিণী এতদিন ধরে স্বামীর জমানো কিছু টাকা ছিল তাই ভেঙ্গে মেয়েকে পড়িয়েছে, টেনেটুনে মা মেয়ের সংসার চালিয়েছে। বাজারদরও বাড়ছে সব জিনিসের, এখন তাতেও কুলোয় না। বাড়ি ভাড়ার টাকাও ওতেই চলে যাচ্ছে। বেঁচে থাকার প্রশ্নটাও এবার বড় হয়ে উঠছিল। মেয়েকে সেটা না জানালেও মিনতিও দেখেছে সেটা।

তাই চাকরীর কথা সেও ভেবেছিল।

এবার মিনতিও চাকরীতে বের হচ্ছে, ভবতারিণী বাধা দিতে পারেনি। মেয়ের বিয়ের জন্য জমানো টাকাতেই হাত পড়েছিল।

মিনতি অবশ্য হাসিখুশি নিয়েই থাকে। অফিসের পর বাড়ি ফিরে নিজেই রাতের রান্নাটা করে নেয়। কখনও মা করে রাখে, হিটারে গরম করে নেয়। ভবতারিণী রাতে শুধু দুধ, দু-একটা সন্দেশ না হয় ফল কিছু খেয়ে নেয়। বাতের ধাত। অনিয়ম হলেই শরীর খারাপ করে।

মিনতি নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

ভবতারিণীর শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না ক'দিন। ভবতারিণীও বলেনি কিছু। সেদিন মিনতির নজর পড়ে, সে শুধোয়।

—শরীর ভালো নয় তোমার?

হাসে ভবতারিণী— শরীরের দোষ কি বাছা? তুইও ব্যস্ত। কলকাতায় হাঁপিয়ে উঠেছি ধোঁয়া আর এই কুয়াশায়।

মিনতি সেদিন অফিসের কোন বান্ধবীদের মুখে দীঘার গল্প শুনেছে। বাইরে বিশেষ যায় নি। দু'টি মেয়ে বাইরে যাবে কি করে অজানা জায়গায়, ভেবেছে দু'একবার।

কিন্তু তার অফিসের সহকর্মী মালা বলে— দীঘা এমন দূর কি? সোজা বাসে উঠে গিয়ে নামবি, কটেজও ভাড়া পাবি। ছোট সুন্দর বাড়ি, ঝাউবনের ছায়ায় বাড়িগুলো। সামনে সমুদ্র। ঘরে খাট-বিছানা জিনিষপত্র, মায় হাড়ি উনুন বাসন সব আছে, যা না দিনকতক ভালো লাগবে।

মালার এক আত্মীয় দীঘায় কাজ করেন, তাকে দিয়েই কটেজ বুক করিয়ে মিনতি চলেছে মাকে নিয়ে।

এই খোলামেলায় এসে ভবতারিণীরও ভালো লাগে। মিনতিও খুশি হয়েছে।

দেখছে সে বাসের যাত্রীদের। বিচিত্র যাত্রীর ভিড়। ওই নব-বিবাহিত মেয়েটিকেও দেখছে সে। মিনতির মনের অতলে একটা বিচিত্র সুর ওঠে, নিজের মনের নিঃসঙ্গতার সুর। জীবনের একঠাই সে শূন্যই রয়ে গেছে। তাই ওদের ওই নববিবাহিত তরুণ তরুণীর জীবনের পূর্ণতাকে সে যেন আজ অন্য চোখে দেখছে।

ভবতারিণীও বলে— নোতুন বিয়ের পর বোধ হয় বেড়াতে যাচ্ছে ওরা।

মিনতি ঘাড় নাড়ে— হবে হয়তো।

ভবতারিণী দেখছে ওদিকের একটা রুটের বাসকে, বাসটাকে দেখা যায় না। ওর ছাদে, পাদানিতে, পেছনে ঝুলছে মানুষ। কোনও মফঃস্বলের দিক থেকে আসছে অমনি বাস বোঝাই হয়ে, তার তুলনায় এই বাসটার আভিজাত্য অনেক বেশী। বেশ রং চং করা, বড় কাঁচ-এর জানলা, আরামদায়ক গদি মোড়া সিট। ওদিকে ক্যাসেটে গানের সুর

বাজে। আর যাত্রীরাও বেশ ছিমছাম। সবাই আরাম আয়েস করে বসে চলেছে, ফাঁকা গাড়িতে।

ভবতারিণী ওই বাসটার অবস্থা দেখে ভীত কণ্ঠে বলে— ওরে মিনু, এ বাসেও অমনি ঠাস বোঝাই ভিড় হবে নাকিরে? তাহলে যে দমবন্ধ হয়ে মারা যাবো।

সমর দেখছে বয়স্কা ভদ্রমহিলাকে। পাশের সিটে সে বসেছিল। ওকে সান্তনা দেবার জন্য বলে সে— না, না। এ বাসে এমন ভিড় হবে না। এ শুধু দীঘার যাত্রীদের নিয়ে যাচ্ছে। এ বাসে অন্য কেউ আর উঠবেনা। সব জায়গাতে থামবেও না। সামনে পাশকুড়ার আগে থামবে চা খাবার জন্য, তারপর সিধে থামবে দীঘায় গিয়ে।

ভবতারিণী দেখছে সমরকে।

ভদ্র শান্ত চেহারা, আজকালকার তরুণদের মত ঝাঁকড়া চুল, হাতে বালা, সরু প্যান্টও পরেনি, মুখে গোঁফ দাড়ির জঙ্গলও নেই, শান্ত মার্জিত ভদ্র চেহারা।

ভবতারিণী একটু ভরসা পায় মনে মনে। বলে সে।

—বাঁচলাম বাবা। যা ভয় হয়েছিল ওই বাসের হাল দেখে, ভাবলাম এখানেও অমনি হবে বোধ হয়।

হাসে সমর।

ভবতারিণী শুধোয়— তুমিও যাবে নাকি?

ঘাড় নাড়ে সমর।

ভবতারিণী বলে— আমরাও ওখানে যাচ্ছি বাবা। আমি আর আমার মেয়ে।

মিনতি বাইরের দিকে চেয়েছিল। মায়ের পথে-ঘাটে এমনি যেচে আলাপ করার অভ্যাস আছে, এখানেও ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে মাকে আলাপ করতে দেখে মিনতি খুব খুশি হয়নি। মাকে নিরস্ত করার উপায়ও নেই।

সে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে চুপ করে।

হরিপদ সরকার পোস্তায় নামকরা ভূষিমালের কারবারী, ইদানীং তার রোজকারে নাকি ক্লান্তি এসে গেছে। প্রথম পক্ষের ছেলে ভূষণ সাপুই এখন কারবার দেখে, হরিপদবাবুর গদিতে টাকার আমদানী কম নেই।

কালো মুষকো চেহারা, গোলগাল বেঁটে মুগুরের মত শক্ত। লোকে বলে, টাকার চাপে ফুলে উঠছে, এবার বেলুনের মত ফেটে না যায়।

হাড় কিপটে ব্যক্তি, এতটাকা তবু পরণে ঠেঁটি ধুতি, ফতুয়া, আর নেশার মধ্যে পান দোক্তা। ওইতেই যা খরচ হয় সেটাও সে ঈশ্বরবৃত্তি থেকেই ম্যানেজ করে।

প্রথমা স্ত্রী গত হবার পর দ্বিতীয়বার সংসার করেছে। প্রথম পক্ষের ছেলেরা এতে মত দেয়নি।

হরিপদ সরকারের তাতেও কিছু যায় আসেনা। কারণ তার গুরুদেব স্বয়ং অনুমতি দিয়েছিলেন এ বিয়েতে। তাই ছেলেদের বলেন—গুরুদেবের আদেশে দ্বিতীয় সংসার করছি। তোদের থাকার যদি অসুবিধা হয় আমি অন্য বাড়িতেই থাকলুম।

হরিপদ সরকার তাই নোতুন স্ত্রী মণিমালাকে নিয়ে নিমতলার ওদিকের বাড়িতে থাকে। তাতে গদির কাজও দেখাশোনার সুবিধা হয়, কাছেই গুরুদেবের আশ্রম, মা গঙ্গাও কাছে। নিত্য গঙ্গাস্নানও হয়।

হরিপদ সরকার দ্বিতীয় সংসার করে আরও গভীরভাবে ব্যবসায় ডুবে গেছে, আর সব পাপ মুছে ফেলার জন্য অর্হনিশি গুরুদেবের নাম নিয়ে চলেছে।

ব্যাপারটা মণিমালার কাছে ক্রমশঃ যেন বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। গরীব ঘরের মেয়ে মণিমালা, লেখাপড়াও শেখার সুযোগ হয়নি। মধ্যমগ্রামের ওদিকে কোনো কলোনীতে মানুষ হয়েছে মামার সংসারে অবহেলিতা আর শাসনের তীব্রতার মধ্যে।

তবু রূপ তার ছিল। সেই রূপ যৌবনের জন্যই হরিপদ সরকারের মত বয়স্ক মানুষটার মনেও ঝড় উঠেছিল। তাই এই বাড়িতে এসেছিল মণিমালা।

মণিমালার মনেও ছিল স্বপ্নের আভাষ। একটি তরুণকে ভালোবেসে

সে সুখী হবে। তার চাহিদাও বেশী নেই। কিন্তু তা হয়নি।

হরিপদ সরকারের ঘরেই আসতে হয়েছিল তাকে। কালো মোটা বয়স্ক লোকটাকে মেনে নিতে হয়েছিল স্বামী বলে। মনের অতলে একটা ক্ষোভও জমেছিল। তাই মণিমালা ক্রমশঃ বদলে গেছে।

দেখছে শুধু টাকা আর ভোগবিলাসকেই।

হরিপদ সরকার অবশ্য হাড় কঞ্জুষ। তবু স্ত্রীর বেলায় তার মনের কোনও একটা দুর্বলতা ছিল। মণিমালা বলে সে দিন— দিনরাত ব্যবসা গুদাম আর গদি নিয়েই থাকবে যদি তবে বিয়ে করেছিলে কেন?

হরিপদ বলে— না! যামু, তোমারে লই তীর্থে যামু।

হাসে মণিমালা— ওসব তীর্থ টীর্থে দরকার নাই। চলনা দিনকতক দীঘায় ঘুরে আসি দুজনে।

হরিপদর গা-ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে মণিমালা। মাঝে মাঝে হরিপদও কেমন দুবল হয়ে ওঠে। তবু মনে হয় একবার বের হলে মন্দ হয় না। টাকার হিসাব সব মাথায় ঠেঁসে বসেছে, শান্তিতে গুরুদেবের নামও করতে পারে না।

মণিমালার কথায় বলে।

—তাই যামু। তবে শুনছি দীঘা পোলাপানের চ্যাংড়ামির জায়গা।

হাসে মণিমালা। সারা দেহে যৌবনের ঝড় তুলে বলে— তাই!

ওর চোখের চাহনিতে কি মাদকতা, বয়স্ক হরিপদের মনেও যেন ঝড় তুলতে চায় সে। বলে হরিপদ।

—কি যে কও নতুন বৌ। যখন কইছ চলো দিনকতক ঘুইরা আসি। নির্জন নিরিবিলিতে গুরুদেবের নাম ও করণ যাইবো। এস্থানে শুধু বিষয় বিষেই জর্জর হইতেছি।

হরিপদ সরকার নির্জনে ইষ্টনাম জপ করে পুণ্য সঞ্চয় করতে চায়। মণিমালা চুপ করে থাকে।

জীবনে একটা দিক তার শূণ্যই রয়ে গেছে। ভালোবাসার কোন স্বাদ সে পায়নি। ওই বিচিত্র অর্থলোভী আর তথাকথিত ধর্মপ্রাণ মানুষটা তাকে দূরেই সরিয়ে রেখেছে। ও যেন এবাড়ির অন্য আসবাবের

মতই আর একটা কিছু।

মণিমালা তবু বের হয়েছে হরিপদকে নিয়ে।

হরিপদ সকালেই মুখে একগাদা পান দোক্তা পুরে জ্যাবজ্যাব করে চিবুতে চিবুতে চাইল মণিমালার দিকে। মণিমালা বল্লে,

—চা খাবো কখন ?

হরিপদ বলে— ওইতো তোমাগোর জ্বালা, সকালেই চা চাই। আমার ইস্টনাম জপ না কইরা খাওন যাইব না, গুরুদেবের আদেশ।

মণিমালা বলে— ক'দিন ওগুলো একটু কমাও বাপু। গাড়ি থামছে মনে হচ্ছে। দোকান পত্তরও রয়েছে এখানে।

হঠাৎ কলকলিয়ে ওঠে— ওমা, গরম চপ ভাজছে। পেঁয়াজ বড়াও আছে।

হরিপদ সরকার বিধর্মী স্ত্রীর দিকে কঠিন চাহনিতে চেয়ে থাকে, বাসটা এসে থেমেছে ওই পেঁয়াজ ডিম-এর বড়াভাজার দোকানের সামনেই। শুধু এইটাই থামেনি, এর আগেও কয়েকটা বাস এসেছে আর তার থেকে যাত্রীদল নেমে চড়াও হয়েছে দোকানগুলোর উপর।

সমরও নেমেছে বাস থামতে। সকালে চা জলখাবার তেমন যুত করে খাওয়া হয়নি এখানেই সেটা সারতে হবে।

ভবতারিণী বলে—হ্যাঁ বাবা, গাড়ি এখানের পর কোথায় থামবে ?

সমর বলে—একেবারে থামবে না কোথাও, বেলা একটা নাগাদ দীঘা পোঁছবে। মধ্যে ভাল দোকান আর পাবেন না, জলটল খেতে হয় এখানেই খেয়ে নিন।

ভবতারিণীর ওসবের দরকার নেই। স্নান আহ্নিক করে দুপুরে একেবারে খায়। তবু ভবতারিণী মেয়েকে বলে,

—ওরে মিনু, জলখাবার কিছু খেয়ে নে একেবারে। চা টাও। কখন পোঁছবি কে জানে !

বাসের অনেকেই নেমেছে। সমরের মনে পড়ে সেবার আসানসোল যাবার পথে দেখেছে শক্তিগড়ে সব গাড়িই থামে; কারণ সেখানের ল্যাংচা বিখ্যাত। কেউ খাবে, কেউ ছাঁদা বেঁধে নেবে। বাতাসে সেখানে

ল্যাংচা ভাজার সুবাস ওঠে। অবশ্য এখন আর সেই সুবাস নেই, তবু অভ্যাস-বসেই সব গাড়ি দাঁড়ায়, সেই দালদার ল্যাংচাও বিক্রী হয়।

এখানে বোম্বে রোডের উপর এই জায়গাটার নামডাকও আছে। সব বাস, গাড়ি দাঁড়ায়, আর এ জায়গায় হাটবাজারও বসে। ফুল তরিতরকারি ডাব বিক্রি হয়, আর এখানের দোকানে রাজভোগ, সিঙ্গাড়া, চপের কদরও কম নয়।

খদ্দেরদের ভিড় সকালে এই সময় উপ্‌ছে পড়ে। গরম চপ আর মুড়ি তৎসহ রাজভোগ পরে চা এখানের মেনু।

সীমা ও নেমেছে, নিমাই বলে— চপ টপ্‌ না খেয়ে রাজভোগ সন্দেশ খাও।

সীমার লোভ ওই চপের দিকে। তবু চুপকরেই থাকে। নিজের রুচির প্রশ্ন এখানে নেই।

মিনতি ভিড়ের মধ্যে ঢুকতে পাবে না। সমরের ডাকে চাইল।

—কোন রকমে গোটা চারেক ডিমের চপ এনেছি, দুটো নেবেন? কিছু না খেলে দুপুর অবধি থাকবেন কি করে?

মিনতিও তা জানে। ওদিকে বাসের সময় হয়ে আসছে। বলে, —দুটো চপই নিন, দেখি চা মেলে কি না। সে মিনতির হাতে চপ দুটো ধরিয়ে ভিড় লক্ষ্য করে এগোলো।

বাস প্রায় খালি। সামনের দিকে বসে আছে মোটা একটি মেয়ে, সাজগোজ-এর বাহারও বেশী, মুখে রং-এর প্রলেপ, শাড়িখানাও দামী, তবে দেহটা বিশাল। সারা সিট ছাপিয়ে ওই মেদের মৈনাক যেন উপচে পড়েছে। পাশের স্ত্রীলোকের পরনেও দামী স্যুট। মুখে কিংসাইজ-এর ইম্পোর্টেড সিগরেট। ওদের ওদিক থেকে দামী বিদেশী সেন্টের তীব্র মদির সুবাস ভেসে আসে।

মেয়েটি বলে— উঃ! হ্যাক্‌নিড। দোকানে চা চপের জন্যে যেন কাঙ্গালীর মত দাঁড়িয়ে পড়েছে। তখনি বলেছিলাম গাড়ি নিয়ে চলো। ভদ্রলোক বলে, গাড়ি কালই এসে যাবে এখানে। ক'ঘণ্টা যে ভাবে

হোক কেটে যাবে।

মেয়েটি হাঁপাচ্ছে। বলে সে—এই হ্যাপ্টি ভিড়ে বিশ্রী লাগে! কখন যে পৌঁছাবে দীঘায়?

হরিপদবাবু বাস থেকে নামতে চায়নি, কিন্তু মণিমালাকে নামতে দেখে সেও নেমেছে। কে জানে মেয়েমানুষ একা কোথায় যাবে। কিন্তু ভিড় দেখে সে হঠে গেছে। আর ডিম পেয়াজের বহর দেখে সরে দাঁড়িয়েছে।

বাস হর্ণ দিচ্ছে, এইবার ছাড়বে।

যাত্রীরা এদিক-ওদিক থেকে দৌড়ে এসে বাসে উঠছে। হরিপদ সরকার মণিমালার চিত্ত চাঞ্চল্য দেখে রেগে উঠেছে। পথে বের হয়ে যেন কচি খুকির মত খুশীতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে সে। ওই পুরুষদের ভিড় ঠেলে দোকানে ঢুকেছে।

হরিপদ সরকার ব্যাকুল ভাবে হাঁক পাড়ে।

—কই গ্যালা অগো! কই গেলা—

কোন ফচ্‌কে ছোড়ার দলও চলেছে বোধ হয়। তাদের একজন বলে, দিদিমা ভেগে গ্যালো নাকি দাদু?

হরিপদ ওদের দিকে রোষকষায়িত নেত্রে চাইল। কিছু বললেই ওরাও নাটক শুরু করবে। ছেলেরা বাসে উঠে পড়েছে। হর্ণ দিচ্ছে ড্রাইভার।

রাগটা পড়ে হরিপদবাবুব মণিমালার উপরই। ভিড় আর ভিড, চারিদিকে নজর দিয়ে খুজছে; হঠাৎ দেখা যায় মণিমালা বের হয়ে আসছে দোকান থেকে—হাতে চপের ঠোঙা বলে সে—

যা ভিড়! গাড়িতে বসেই খাওয়া যাবে।

হরিপদ চাইল ওর দিকে। সে বলে চাপা রাগতস্বরে—

কি যে করছো? চলো দেখি বাস ছাড়বো।

বাসে উঠেছে সকলেই। কেউ চা জলখাবার খেয়েছে, কেউ গাড়িতেই ঠোঙায় করে মুড়ি আর চপ নিয়ে চিবুতে চিবুতে চলেছে। মণিমালাও চপ চিবুচ্ছে, হরিপদ সরকার গর্জে ওঠে চাপাস্বরে।

প্যাঁজ ডিম খাইছ?

—কেন ? অবাক হয় মণিমালা !

—অখাদ্য কুখাদ্য খাতি গুরুদেবের নিষেধ আছে।

মণিমালা বেপরোয়ার মত বলে।

তোমার গুরুদেবের নিষেধ তুমি মানো, আমার বাপু ওসব সইবে না।

মিনতির মুখে হালকা হাসির আভা জাগে। সে দেখছে বাসের বিচিত্র যাত্রীদের। ওই বয়স্ক ভদ্রলোকের চপলা স্ত্রীকে দেখছে, তার ব্যবহারে সেও মজা পেয়েছে। হেসে ফেলে ওদের কথায়, হঠাৎ সমরের দিকে চেয়ে মুখ নামিয়ে নেয়।

ওর হাসিটা সমরের নজর এড়ায় নি। সমর কারণটাও জেনেছে।

ওই বয়স্ক ভদ্রলোক তখন স্ত্রীর পেঁয়াজ আর ডিমের চপ-এর গন্ধে বোধ হয় নাকে কাপড় চাপা দিয়ে ইষ্টনাম স্মরণ করে চলেছে।

সকালের আলো এখন সোনা রং বদলে অভ্র রং ধরেছে। দুপাশে মাঠ, একটা খাল রাস্তার পাশ দিয়ে চলেছে ক্ষীণ জলধারা বুকে নিয়ে।

পিছনের সিটে কয়েকজন ছেলেও চলেছে দীঘা ভ্রমণে, তারা বাস-এর মধ্যেই তার স্বরে কোন হিন্দীগান ধরেছে, ওদের দু'একজন আবার অমিতাভ বচ্চনের ভঙ্গীতে হাত-পা নেড়ে গানের তালে তালে নাচ শুরু করেছে। হৈ হৈ করছে তারা বাস-এর যাত্রীদের সব শান্তি ভঙ্গ করে।

ওদের মধ্যে কে চীৎকার করে একটু পোজ দিয়ে বলে—নাচো গুরু।

নাচিয়ে ছেলেটিও অঙ্গভঙ্গী শুরু করে দেয় এবং চীৎকার করে,

—সাবাস পটলা।

কে শোনায় জোর সে নাচ, বৈকালে চুল্লু খাওয়াবো পটলা। দীঘার নাম্বার ওয়ান চুল্লু আর কষা মাংস।

সমর চেয়ে দেখছে ওদের।

আজকের যৌবনের এই বিকৃতি সে অনেক দেখছে কলকাতার রাস্তা-ঘাটে, নোতুন কিছু নয়। তাই বিস্মিত হয়নি বিরক্ত হয়েছে মাত্র।

সামনের সিটে বসেছিল সেই পালিশকরা লতিকা, আর বাদল রায়।

ওদের মুখচোখে বিরক্তির চিহ্ন। লতিকা চাপাস্বরে গজগজ করে—

ন্যাষ্টি। তাই বলেছিলাম অভদ্র ইতর পরিবেশে যেতে পারবে না। গাড়িতে চলো। এখন দেখছো ব্যাপারটা ?

বাদল রায় দামী ইম্পোর্টেড সিগারেট ধরিয়ে বিরক্তি চেপে বলে —চুপ করে থাকো, ওরা টায়ার্ড হলেই থেমে যাবে, আর দীঘাও পৌঁছে যাবো লাঞ্চের আগেই।

এদের সমাজ এই মানুষগুলোর থেকে স্বতন্ত্র। বাদল রায় লতিকা-দের সমাজে এইসব ইতিজাতের ঠাই নেই।

অবশ্য বাদল রায় অতীতে প্রায় এমনি কোন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেই ছিল। বাবার সামান্য চাকরী, কষ্টে সৃষ্টে লেখাপড়া করেছিল ; এর ওর দয়া কুড়িয়ে স্কুলে ফ্রিশিপ পেয়েছিল বইপত্রও সব ছিল না। এখান-ওখান থেকে জোগাড় করে পড়তো।

তবু মনে মনে তখন থেকেই বাদলের একটা দুরাশা ছিল তাকে বড় হতেই হবে। জীবনের সেই কষ্ট, অভাব, অপমানও সে মনের মধ্যে চেপে রেখে মুখবুজে লড়াই করেছিল।

পরীক্ষার বেড়াগুলো একটার পর একটা ভালোভাবে টপকে সে ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজে ঠাঁই পেয়েছিল।

তারপরই লতিকার বাবার সঙ্গে পরিচয় হয়, ওদের কারখানাতে কাজ নিয়েছিল পাশ করে। লতিকার নামেই তার বাবা ওই ইন্‌জি-নিয়ারিং কারখানা করেছিলেন। লতিকা ইন্‌জিনিয়ারিং ওয়ার্কস।

বাদল ক্রমশঃ কাজ দেখিয়ে মালিকের নজরে আসে।

শ্রমিক আন্দোলনগুলোকেও কৌশলে বানচাল করতে পারতো বাদল সহজাত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বড়ের চাল দিয়ে। এক ইউনিয়নের পিছনে অন্য ইউনিয়নের নেতাদের হাত এনে লাগিয়ে দিত ; প্রডাকশন, সেলস্ সব দিকেই তার নজর।

হোটেলে পার্টি দিয়ে পার্টিদের কাছে দামী অঙ্কের প্রণামী দিয়ে লতিকা ইন্‌জিনিয়ারিং-এর মাল সবই বিক্রী করতো সে। অর্ডারেরও কমতি ছিল না।

এহেন কৃতি ছেলেকে লতিকার বাবা হাতছাড়া করতে চাননি। ওঁর একমাত্র আদুরে কন্যা লতিকাকে তুলে দিয়েছিলেন বাদলের হাতে।

বাদল ভাবতে পারেনি যে কর্মী থেকে সেইই ফ্যাক্টরীর ডিরেক্টর হবে, ভবিষ্যতে হবে মালিকই শ্বশুরমশায় গত হলে।

আধা বস্তিতে শত অভাবের মধ্যে অপমান সয়ে বড় হয়ে ওঠা ছেলেটির ভাগ্যে এই ভাবেই অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যেও জুটে যায়।

অবশ্য লতিকার অর্থ-সম্পদ সবই আছে, আর আছে দেহ জুড়ে মেদের প্রাচুর্য। দেহের স্তরে স্তরে ওর মাংসল আভাষ। রংটাও ফর্সা, হয়তো এককালে মুখশ্রী সুন্দর ছিল, কমনীয়তাও ছিল। কিন্তু এখন সে সব আর নেই। মুখটা হয়ে উঠেছে গোলাকার, নাক চোখও ঢেকে গেছে প্রায়। আর দেহেও তেমনি মেদের সঞ্চার হয়েছে।

লতিকা শুনছে ওই পেছনের ছেলেগুলোর চাপা মন্তব্য।

—সাদা হাতিরে।

লতিকার জ্বালাটা ওইখানেই।

বাদল রায় অবশ্য এহেন বৈভবশালী স্ত্রীকে সমীহ করে চলে। আর বাদল রায়ের মত চালু লোক জানে যে লতিকাকে ঘাঁটানো নিরাপদ নয়।

তবু বাইরে বাদল তার ফ্যাক্টরী, পার্টি আর অনেককিছু নিয়ে তার স্বতন্ত্র একটা জগৎ গড়ে তুলেছে। পিছনের জীবনটা তার বঞ্চনা, শূণ্যতা আর অপমানে ভরা। বর্তমানে সে যেন তাই কিছুটা মরীয়া হয়ে অতীতের শূণ্যতাকে পূর্ণ করে তোলার সব রকম চেষ্টাই করে চলেছে, লতিকা ওর বাইরের জীবনের সেই বিচিত্র খবরগুলো সম্বন্ধে কিছু জানে না।

খড়্গাপুর ছাড়িয়ে বাসটা চলেছে।

বেলা বেড়ে ওঠে। এবার বাসের যাত্রীদের মাঝে ক্লান্তি নামে পিছনের সিটের সেই [illegible]টুর দলের নাচ গানও থেমে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ নেচে গেয়ে তারা [illegible]ছে। দু'একজন যাত্রী ঝিমুচ্ছে। দ্রুত
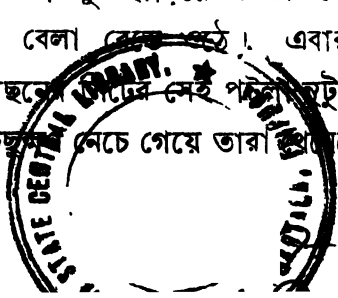
একটানা গতিতে মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ মাঠ প্রান্তর পার হয়ে যাত্রীবাহী বাসটা ছুটে চলেছে।

হঠাৎ ব্রেক কসার ফলে বাসের মধ্যে একটা আলোড়ন পড়ে যায়। তন্দ্রাচ্ছন্ন মানুষগুলোর নিশ্চিন্ত নিদ্রায় ছেদ পড়েছে। বাঙ্ক থেকে ছিটকে পড়েছে একটা হোল্ডঅল সিধে বিশাল দেহী তন্দ্রাচ্ছন্ন হরিপদ সরকারের ঘাড়েই, অতর্কিত আঘাতে মেজেতে ছিটকে পড়ে হোল্ডঅল তার উপর।

তারকেশ্বরের এক নম্বর সাইজের নধর কুমড়োর মত গড়াচ্ছে স্থান-চ্যুত হয়ে হরিপদ সরকার।

ওদিকে পটলার দলের কোন সিটকে-মার্কা একটা ছেলে মেজেতে রাখা স্যুটকেশের উপর বডি থ্রো করছে, ভবতারণীর মাথাটা ঠুকে যায় সিটের গদিতে।

হরিপদ সরকার পপাত অবস্থাতেই চীৎকার করে—

ওহে ডেরাইভার, গাড়ি চালাইতে জানো না এডা করছ কি? মানুষ মারার কল করছো? পরক্ষণেই মণিমালার উদ্দেশ্যে কলাগাছের মত পুরুষ্ট হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলে—অয়, তুমারেও কই দেখবা তো মানুষডারে? সামলাইবা তো। ইস্ত্রীকে লই আনছি ক্যান? তোলো আমারে।

ওই আড়-কাঠে লেগে পড়ে থাকা গাছের গুঁড়িকে টেনে তোলার সাধ্য নেই মণিমালার। সমর এদিকের সিটে বসেছিল, হরিপদকে ওই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে দু'একজনের চাপা হাসির শব্দ ওঠে।

সমরই হাত ধরে ওকে টেনে তুলে। হরিপদ দণ্ডায়মান হয়ে চারি-দিকে চেয়ে বলে—এত হাসির হইল ডা কি? এডা বাস না নাট্যশালা?

কাজল চুপ করে দেখছে।

রমেন তখনও ঘুমুচ্ছে। ওর লম্বা এলোমেলো চুল, ক্লান্ত চোয়াড়ে মুখটা দেখে কাজল, ক্রমশঃ তার সকালের মেজাজটা বদলে যাচ্ছে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে।

মনে হয় হুট করে রমেনের মত একটা বিচিত্র ছেলের সঙ্গে অজানা পরিবেশে—বাড়িতে বিয়ে বাড়ি যাবার মত মিথ্যা কথা বলে বের হয়ে ভুলই করেছে।

ঘরের ছোট পরিধির মধ্যে, ছোট্ট সীমার মধ্যে রমেনকে দেখেছিল কাজল। সেদিন রমেনকে ভালোই লেগেছিল। কারণ তার ছোট্ট জগতের পরিধির মধ্যে রমেন ছিল একক নায়ক।

কাজল তখন স্কুলে যায়। রূপও ছিলনা তা নয়, আর ছিল তার নিটোল যৌবন। দরিদ্রের ঘরের মেয়ের ওই রূপ-যৌবন থাকা অনেক বিড়ম্বনার সেটাও বুঝেছে কাজল।

সাধারণ শাড়ি জামা ছাড়া বেশী কিছু জোটেনা তার।

তবে কাজল এমনিতে ছিমছাম থাকে। নিজের হাতে সব কেচে ইস্ত্রি করে। সামান্য প্রসাধন আর ওই শাড়ি জামাতেই কাজল নিজেকে সাজিয়ে তোলে।

স্কুল থেকে আসার সময় ক'দিন ধরেই দেখছে পার্কের ধারে ওপাড়ার দু'চারজন মস্তান রকে বসে মাটির ভাঁড়ে চা খায়, সিগ্রেট ফোঁকে আর কাজলকে ফিরতে দেখলেই ওদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়।

একটা সিটকে ছেলে সাইকেলে চেপে অকারণই তার চাবপাশে পাক দিয়ে যায়, কেউ সিটি বাজায়। কাজল ওদিকে না চাইবার ভাণ করে কোন রকমে সরে আসে। তাদের দু'চারটে বিশ্রী মন্তব্যও কানে আসে। কে বলে—

যাবে নাকি? তাহলে চলোনা মাইরী 'প্রেম দুনিয়া' জব্বর ছবি ম্যাটিনিতে মেরে দিই।

কাজল এড়িয়ে চলে আসে।

কে বলে—হড়কে গেল যে বে কালু! এই তোর মুরোদ?

কালু গজরায়—ঠিক আছে!

কাজল সেদিন ফিরছে স্কুল থেকে, হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ায় সেই

কালুই। ইয়া জুলফি, একমাথা চুল, সিটকে চেহারা, চাপা চুষ প্যাণ্ট পরা ; শুকনো পা দুটো যেন ঠেলে উঠেছে প্যাণ্টের মধ্যে।

কালু এগিয়ে এসে কাজলের সামনে দাঁড়িয়ে বলে।

—শোনো।

কাজল ভয়ে ভয়ে চাইল, পথে লোক-জনও বিশেষ নেই, কালু বলে—ওঠো জিপে, খুব ডাঁট দেখেছি, শ্লা কালুকে চেনোনি! তুলে লিয়ে যাব। ভয় নাই, বলোতো সাত পাক ঘুরিয়ে সিন্দুরও দেগে দোব কালিঘাটে নে গিয়ে, কোন শ্লা কিছু করতে পারবে না। ওঠো!

ভয়ে কাঁপছে কাজল, কালুর দলের দু'তিনজন জিপে রয়েছে, আজ কাজলের সর্বনাশই করবে ওরা। কালু গজরায়।

—সোজা কথায় উঠবে না টেনে তুলতে হবে? এ্যাই ভোঁদা—অন্যজন নামছে জিপ থেকে।

হঠাৎ সাইকেল একটা এসে পড়ে, তার থেকে নামছে একটি ছেলে।

কিছু বলার আগেই ছেলেটির লাথি খেয়ে কালু ছিটকে পড়েছে, অন্যজনও এগিয়ে আসতে গিয়ে ছেলেটির বাম-ঘুসি খেয়ে পেট চেপে-ধরে বসে পড়ে।

কাজল এসব দেখতে অভ্যস্ত নয়।

ছেলেটি গর্জায়—কি রে কেলো খুব মস্তানি করছিস এখানে শুনছিলাম, ফের যদি কোনদিন এ পাড়ায় দেখি, জানে খেয়ে নেবে এই বমেন।

কালু কদমাক্ত অবস্থায় নদমা থেকে উঠেছে, পাথরে লেগে ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরছে। ছেলেটি গর্জায়।

—আজ ছেড়ে দিলাম, ফের যদি এ পাড়ায় দেখি খতম হয়ে যাবি, যা।

কাজল ভীত বিবর্ণ-মুখে নাটক দেখছে।

কালু রক্তাক্ত অবস্থায় ভোঁদাকে নিয়ে জিপে উঠে চলে গেল।

কাজলের পা দুটো যেন পথের সঙ্গে সেঁটে গেছে, হঠাৎ খেয়াল হয় ছেলেটির ডাকে।

—বাড়ি যাবে তো?

কাজল চাইল ভীরু ত্রস্ত চাহনি মেলে, ছেলেটি বলে।

—তুমি গোবিন্দবাবুর মেয়ে না? ওই রেশনের দোকানের পাশের গলিতে থাকো না?

ঘাড় নাড়ে কাজল।

রমেন বলে—চলো, ওদিকেই যাবো। পৌঁছে দিয়ে যাই।

কাজল চলেছে ওর পিছু পিছু।

ছেলেটিকে দেখছে, কাজল ও পাড়ার বারোয়ারী পূজার পাণ্ডা; সবটাতেই যেন আছে সে। রমেন বলে—

—ব্যাটাদের সিধে করে দিয়েছি। আর এ মুখো হবে না।

কাজল বলে—ওরা খুব ইতর।

রমেনকে তাদের বাড়ির কাছে দেখে কাজলের দাদা বিশু খুশি হয়। বিশু ইদানীং স্কুল ফাইন্যাল দিয়ে চাকরীর চেষ্টা করছে। আর পড়ার সঙ্গতিও নেই। দুবারের চেষ্টায় পাশ করার পর পড়ার উৎসাহও নেই তার।

রমেন পাড়ার মাতব্বরই।

এখানের এম-এল-এর পার্শ্বচর। পাড়ার ওদিকে কোন কারখানার ইউনিয়নের পাণ্ডা। প্রতাপশালীরা রমেনকে সবাই খাতির করে। পাড়ার বেকার ছেলেদের কাছে সে যেন কামধেনু।

তাই রমেনকে দেখে বলে।

—এতদূর এলে এক কাপ চা না খেয়ে যাবে? চলো।

রমেন ইতিউতি করে কি ভেবে এগিয়ে গেল।

এসব পরিবেশ রমেনের খুব পরিচিত। নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের এই স্বরূপটা সর্বত্রই কম-বেশী একরকমই। প্লাস্টার খসা এঁদো বাড়ি, সেকেলে কবেকার কেনা বিবর্ণ খাট, ভাঙা চেয়ার। একটি ময়লা কাপে চা এলো।

তবু ভালো লাগে রমেনের।

কাজল মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে আছে। গোবিন্দবাবুর স্ত্রী সব শুনে ভীত কণ্ঠে বলে—কি হবে বাবা রমেন? মেয়ে স্কুলে যায়।

রমেন বলে—কোন ভয় নেই মাসীমা। আমি নজরে রাখবো। ওরা আর সাহস করবেনা কিছু করতে।

কাজলের মা বলে, তবু তুমি আছো ভরসা পেলাম। এদিকে সংসারের হাল তো টলমল করছে। তোমাদের মাষ্টার মশাইও রিটায়ার করবেন সামনের মাসে। ছেলেটা পাশ করে বসে আছে, চাকরী-বাকরী নেই।

রমেন কি ভাবছে।

এদিকের দু'তিনটে ফ্যাক্টরীর মালিক তার হাতের লোক। নোতুন লোকজন নেবার বেলায় রমেনেরও কিছু বলার থাকে, রমেন এমনি ভাবে তার দলের কিছু ছেলের চাকরী করে দিয়েছে।

কাজলের দিকে চাইল রমেন।

মেয়েটির পিঠ ছাপিয়ে নেমেছে একরাশ কালো চুল, ফর্সা সুন্দর সলজ্জ আবেশ ওর মুখে। সারা দেহের রেখাগুলো মাদকতা নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

রমেন কি ভাবছে। তার হিসেবী মন খুব তাড়াতাড়িই প্লানগুলো ভাবতে পারে। রমেন বলে মাসীমা—বিশুকে পরে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন। বিশু, তুই সামনের সপ্তাহে একদিন চলে যাস্ আমার কাছে। দু'এক জায়গায় বলে রাখি, দেখি কি করা যায়।

বিশুও খুশী হয়। রমেনদা চেষ্টা করলে তার বেকার দুঃসহ জীবনের রূপ বদলাবে। বিশু বলে—তাই যাবো।

ওর মাও যোগান দেয়।

—তুমি চেষ্টা করলে ওর একটা গতি হয়ে যাবে বাবা। একটু দ্যাখো, সংসারের হাল বদলাবে তুমি দেখলে। ভগবান তোমার ভালো করবেন বাবা।

রমেন বলে, দেখি চেষ্টা করে—আজ চলি মাসীমা। চলি কাজল!

কাজল চাইল মাত্র। রমেন বলে—

তুই যাস্ বিশু, আর এর মধ্যে কোন খবর থাকলে আমিই চলে আসবো এক ফাঁকে।

কাজলের মা বলে, সময় পেলেই এসো বাবা। তুমি এলে তবু ভরসা পাই।

রমেন কথা রেখেছিল। পরের সপ্তাহেই এসেছিল সুখবরটা নিয়ে। উল্টোডাঙ্গায় এক ফ্যাক্টরীতে বিশুর জন্য একটা কাজের ব্যবস্থাও করেছে।

কাজল খুশী হয়—তাই নাকি!

কাজলের মা বলে—ঠাকুরকে সওয়াপাঁচ আনার পূজো দেব বাবা। তোমার জন্যই বিশুর কাজটা হলো। ওরে কাজল চা দে রমেনকে।

রমেন এখন এ বাড়িরই একজন হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে আসে। কাজলের বাবা গোবিন্দবাবুও আসতে বলে।

—কাজলও পাশ করবে এবার, আমিও রিটায়ার করছি।

রমেন বলে—কাজলের জন্য ভাববেন না মেসোমশাই। পাশ করে ও টাইপ ইস্কুলে ভর্তি হোক টাইপটা শিখে গেলে নবুদাকে বলে কোনও অফিসে ঢুকিয়ে দেবো। আজকাল মাইনেও ভালো দেয়; দু' এক জায়গায় নিয়ে যাবো কাজলকে, জানা-চেনা করিয়ে দেব।

কাজলের মা এখন রমেনের উপর পুরো বিশ্বাস করে।

তবু বিশুর চাকরী হওয়ায় কিছুটা সুবিধা হয়েছে তাদের। স্বপ্ন দেখে কাজলের মা কাজলেরও ভালো চাকরী হয়েছে। সেজেগুজে আপিসে যাচ্ছে, মাসের শেষে মোটা মাইনে আনবে মেয়ে।

সংসারের হাল বদলাবে।

আর ভালো চাকরী করলে বিয়েও হবে ভালো ঘর বরে। কাজলের মা বলে রমেনকে।

—তা নিয়ে যাও বাবা। তুমি তো এ বাড়ির ছেলের মতই। কাজলের একটা বিহিত হলে আমিও বাঁচি বাবা।

রমেন ক্রমশঃ ওদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এখন।

তবু কাজলের কাছে হঠাৎ আজ ব্যাপারটা যেন খুব আনন্দদায়ক বলে বোধ হয় না এই ভাবে আসাটা।

বাসটা চলেছে—কাজল শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বাইরের দিকে।

সীমাও চেয়ে আছে বাইবের দিকে। মাথায় ঘোমটা দেওয়ার অভ্যাস নেই। বাতাসে গাড়ির গতিবেগে মসৃণ সিল্কেব শাড়িটা খসে পড়েছে, নিমাই চুপ করে বসে আছে। বাইরে দেখা যায়, হঠাৎ সবুজ মাঠের রূপ বদলে গেছে। একটা খাল বয়ে গেছে, ত্বু'একটা নৌকা চলেছে খাল দিয়ে, ওপাবেই শুরু হয়েছে বালিয়াড়ি, কাজুবাদাম গাছের সবুজ জটলা, কেওড়া গাছেব বাজত্ব।

নির্জন বালিযাড়িতে স্বতন্ত্র একটি পরিবেশ গডে উঠেছে। সীমা বলে, সমুদ্র এসে গেছে না?

নিমাই চাইল। বলে সে, না না, দীঘা এখনও কিছু দূব। এখানে কোন কালে বোধ হয় সমুদ্র ছিল। এখন অনেক দূবে চলে গেছে, বয়ে গেছে ওই গাছ—কেওড়া ঝোপ।

দ্রুত গতিতে বাসটা চলেছে। বাদল বায় ঘড়িব দিকে চেয়ে বলে, ন্যাষ্টি। প্রায একটা বাজে এবপব সি হক লাঞ্চ দেবে কিনা কে জানে'

লতিকাব ভাবি দেহেব খোবাকটা এমনিতেই বেশী।

বলে সে, ওমা' তাই নাকি' তখনই বলেছিলাম গাডি নাও, তা শুনলে না।

মিনতি দেখছে ম্যাগাজিনটা।

বাসেব দোলানিতে লেখাগুলো পডা যায না, ছবিগুলোতে চোখ বোলাচ্ছিল; পথেব শেষ যেন নেই। মাঝে মাঝে বাস্তা খাবাপ। বাস ধুলো উডিযে চলেছে শষ্যবিক্ত ক্ষেত—মবা বিলেব খাতেব ধাব দিযে। রুক্ষ মাটি, তবু সবুজ গ্রামগুলো দাঁড়িয়ে আছে নাবকেল-বাঁশবনেব জটলা নিয়ে।

সামনে দেখা যায় একটানা লম্বা বাঁধ, তাব পবই শূন্য বিস্তীর্ণ দিগন্তসীমা। একটু পবেই সুরু হয সবুজ কালো ঝাউবনেব প্রহবা।

কনডাক্টারের ডাকে বাসেব স্তিমিত যাত্রীদেব চমক ভাঙ্গে।

কনডাক্টাব ঘোষণা কবে—দীঘা এসে গেছি।

যাত্রার শেষ।

বাসের যাত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগে। বাসটা ছোট লোকালয়ে ঢুকেছে। দেখা যায় দু'দিকে ওর ঘন সবুজ ঝাউবন, নারকেল গাছের সারি, সামনেই একটু বাগান তারপরই দেখা যায় লোকালয়, ওর পাশেই নীল সফেন সমুদ্র। বোধহয় জোয়ারের বেলা।

ঢেউগুলো তীরভূমিতে সগর্জনে ভেঙ্গে পড়ে।

বাসটা গিয়ে থামলো ওদিকের বাস স্ট্যাণ্ডে।

যাত্রীরা এবার নামছে, মালপত্র টানাটানি করে। বাসটাকে এসে ঘিরেছে রিক্সাওয়ালার দল, কিছু ছুটকো বাচ্চারাও। সরু গলায় হাঁক পাড়ে—হোটেলে যাবেন বাবু? 'সি হক্', 'নীলাচল', 'গেরেট এস্টার', 'টুরিসলজ',—'সৈকতবাস'—না 'ডরমেটরীকে' নিয়ে যাবো বাবু? এই-টুন পথ রিক্সাওয়ালা ধমক দেয় ওদের—হঠ্। হঠ্ বলছি।

কতটুকু পথ, কোন হোটেল কোথায়, 'ডরমেটরীই'-বা কতদূরে এসব গোপনীয় তথ্য নোতুন যাত্রীদের জানাতে চায় না তারা।

ওরাই হাতাহাতি করে মাল তুলছে রিক্সায়।

যাত্রীরা বাধা দেয়—এ্যাই থামোতো। লুটপাট স্বুরু করবে নাকি?

তারা নিজের হিসাবে যেতে চায়, আর এরা চায় সেই হিসাবটা গড়বড় করে দিতে।

সমর স্যুটকেশ ব্যাগটা নিয়ে নেমেছে।

এর আগেও সে দু'একবার দীঘা এসেছে। স্থতরাং এখানের হাল-চাল জানে সে।

হরিপদ সরকার নেমে ওই ভিড়ে দিশাহারা হয়ে স্ত্রীকে হাঁকে।

—কই গ্যালা গো। এ্যাই যে আমি—আরে অ রিক্সাওয়ালা, মাল লই যাও কই? আরে আমোগোর ওনারে লই যাইবো তো! থামো দেহি। কই গো—

সেই পটলার দলও নেমেছে, ওদের দলেব কে বলে ওঠে—ও দাহু, দিদিমা ভেগে গেলো নাকি?

মণিমালা বিরক্ত হয়ে স্বামীকে চাপাস্বরে ধমকায়।

—এত হামলাচ্ছো কেন ? এই তো রয়েছি।

হরিপদ সরকার নিশ্চিন্ত হয়ে বলে—বিদেশ জাগা, হুঁসিয়ার থাকতি হইবো। ওঠো দিন্ রিক্সায়। চলো সৈকতাবাসে যাইমু।

—শুনছেন!

সমর চাইল মিনতির ডাকে। মিনতি মাকে নিয়ে নেমেছে। মালপত্র গুছিয়ে রিক্সায় তুলতে গিয়ে হাতের ম্যাগাজিনটি দেখে তার খেয়াল হয়। সমরের পত্রিকাটাই তুলেনিয়েছিল সে বাসে সময় কাটাবার জন্য। ওটা হাতে নিয়েই নেমেছিল।

মিনতি বলে—আপনার বইটা নিন্।

—ও! খেয়াল হয় সমরের।

ভবতারিণী নেমে দেখছে চাবিদিকে। সামনে বাজাব লোকালয় দোকানপাটের ভিড় রয়েছে। ওদিকে বালিয়াড়ির টিলার উপর সুন্দর বাগানঘেরা বাংলো। বেশ ঝকঝকে বাড়িও রয়েছে।

নোতুন জায়গা। ভবতারিণী একটু নিবাপত্তাব অভাবই বোধ করছে। ছুটি মাত্র মেয়ে মানুষ।

মিনতি একটু স্বাধীন গোছেরই' ভবতারণী তা নয়।

সমরকে দেখেছে বাসে। ছু'চাবটে কথাও বলেছে। সেই সুবাদে শুধোয় সে সমরকে—কোথায উঠবে বাবা •

সমর বলে—সৈকতাবাসে। আপনারা ?

ভবতাবিণী সঠিক তা জানেনা। তাই বলে—মিনু, আমাব মেয়ে জানে।

মিনতি জানায়—কটেজ পেয়েছি আগে থেকে। ওখানেই উঠবো।

ভবতারিণী শুধোয়—সেটা কোন দিকে ?

—ওই তো একটু আগেই বাঁ হাতে গেলেই পাবেন। সমব জানায়।

ভবতাবিণী বলে ভীত স্বরে—বেশ ভালো জায়গা তো, কোন রকম ঝনঝাট নেই তো বাবা ? অজানা জায়গা তারা মেয়েছেলে—

সমর বলে—না না। ভালো জায়গাই।

মিনতি বলে—চলো মা। দেরী হয়ে যাচ্ছে।

মিনতি জানে মায়ের দুর্বলতার খবর। একবার কথা সুরু করলে সে

থামবে না। সমরকে এসময় এড়াবার জন্যই বলে সে—চলি। মা রিক্সায় ওঠো।

ভবতারিণী সমরকে বলে—চলি বাবা।

পথের পরিচয়, ক্ষণিকের মধ্যে ভবতারিণীর কাছে সমর যেন অনেক দিনের চেনা হয়ে উঠেছে।

বাসের ছড়ানো যাত্রীরা তখন যে যার আশ্রয়ের দিকে চলে গেছে। আবার কেউবা চলেছে আশ্রয়ের খোঁজে। দীঘার ঝাউবনে সূর্যের আলো তখন তির্যক রেখায় পড়েছে। সমরও এগিয়ে চলে সৈকতবাসের দিকে।

হরিপদ সরকার ব্যবসাদার লোক। তাই রিক্সাওয়ালার কথায় ফুঁসে ওঠে—কি কইলা? এক টাকা?

সৈকতাবাসের অফিসে মালপত্র নামিয়েছে, আরও কিছু যাত্রী এসেছে, কেউ রয়েছে আগে থেকেই। লাউঞ্জেও রয়েছে অনেকে।

হরিপদবাবুর গলার স্বরে তারা চাইল।

হরিপদ সরকার বলে—ওই তো আইলা দু'শো গজ পথ, তার জন্য কও এক টাকা? অষ্ট আনার একপয়সাও বেশী দিমু না।

এখানের রিক্সাওয়ালারা জানে রিক্সায় উঠলেই এক টাকা। তাই সেও জানায়—এক টাকাই লাগবে।

সরকারমশাই একটা আধুলি ফেলে দিয়ে বলে, অষ্ট আনা দিলাম গলা কাইটা ফ্যালো তবু আর দিমু না!

সমরকে ঢুকতে দেখে বলে, ছ্যাহেন মশাই, এইটুন আইছে। বলে কিনা এক টাকা! কাইটা ফ্যালো আমারে—

রিক্সাওয়লাও বিপদে পড়েছে। আট আনার জন্যে আস্ত মানুষের গলা কাটার সাহস তার নেই। তাই মিন মিন করে।

—যা রেট তাই বললাম! তবে না শুধিয়ে উঠলেন কেন?

লোকজন দেখছে। হরিপদ তবু নাচার। পিছু হঠতে হলো রিক্সাওয়ালাকেই। এবার হরিপদ বিজয়ীর মত কাউন্টারে গিয়ে পকেট থেকে

বুকিং-এর কাগজটা দেখিয়ে বলে।

—ভালো এ্যাকখান্ ঘর দিবার লাগবো।

ওর দোকানের ম্যানেজার আগে থেকেই বুক্ করেছিল, তাই ঘর পেতে অসুবিধা হয়না হরিপদবাবুর।

সমর রেজিস্ট্রারে সই করে ঘরে যাবার আগে ওখানকার ক্যানটিনে খাবার কথা বলে যায়। বেলা হয়ে গেছে। এখন না বলে গেলে আর খাবারও থাকবে না।

ম্যানেজার বলে—স্নান টান করে চলে আসুন। বেলা হয়ে গেছে।

সমর বেশ কয়েক বছর আগে দীঘায় এসেছিল। তখন দীঘার রূপ ছিল শান্ত. নির্জন আর ঘন সবুজ। দিনান্তে দু'.তিনখানা বাস কোন-বকমে খড়গপুব থেকে কাঁথি সহর ছুঁয়ে এখানে আসতো। বাস যেখানে থামতো তার পাশেই ছিল মাটির দেওয়াল খড়ের চাল দেওয়া কিছু দোকান পত্র। মুড়ি-চিড়ে চাঁপা কলার দু'চারটে ছড়া মিলতো, আর ফাঁকা জায়গায় সকালে দু'চারজন স্থানীয় লোক কিছু শাকসব্জী, পুকুর ডোবাব কই মাগুর বা বাচ্ছা পোনা নিযে বসতো। আর ছিল দু'চারটে চায়ের দোকান।

থাকার জায়গা বলতে সরকারের আট দশটা সিঙ্গল রুম, ডবল রুম কটেজ, দু'তিনটে হোটেল। কোন বাহার ছিলনা তাদের। মাথাগুঁজে থাকা যেতো মাত্র, আহার্যও মিলতো কিছু। তাও কিছু আহামরি গোছের নয়।

সন্ধার পর একটা জেনারেটারে যৎসামান্য বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে কটেজগুলোয়, পথে, দু'একটা আপিসে দেওয়া হতো ; রাত্রি দশটার পর সেটাও বন্ধ হয়ে যেতো। দীঘার সমুদ্রতীরে কটেজগুলোর ধারেই ছিল উঁচু বালিয়াড়ি, সেগুলোতে ছিল গভীর-ঘন সবুজ ঝাউবন।

এখন এদিকে সৈকতবাস—অন্য যাত্রী নিবাস, কটেজ মায় অভিজাত হোটেল গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে এখন বালিটিলার উপর নোতুন ব্যারিস্টার্স কলোনী, এসবের চিহ্ন মাত্র ছিল না। ছিল জনমানবশূন্য

ধূ ধূ বালিয়াড়ি আর বালির টিলা নিষ্করুণ শূন্যতা বুকে নিয়ে।

এদিকে সৈকতাবাসের পিছনেই সবুজ বাগানঘেরা টিলার উপর বাংলোটা শুধু রয়ে গেছে। ওটাই দীঘার আদি বাংলো, আর ওপাশের টিলার উপর ছিল সরকারী ইনস্পেকশন বাংলো। অবহেলিত একতলা সাবেক আমলের খিলানের থামওয়ালা রং-চটা—চূণপলেস্তারা খসা। বাংলোটার সামনে ছিল প্রাচীন নিমগাছ।

ওপাশেই ছিল নাড়াজোলের রাজাদের একটা সুন্দর বাগানঘেরা সাজানো বাড়ি।

চারিদিকে সুন্দর সীমা প্রাচীর, ভিতরে সাজানো বাগান। প্রশস্থ বাড়িটাও সাজানো ছিল সুন্দর ছবি-টবি দিয়ে, এই দীঘা ছিল তখন নাড়াজোলের জমিদারদেরই এলাকা।

··দীঘায় এই তিনটি বাংলোই ছিল সেই যুগে।

টিলার উপর শান্ত সবুজ পরিবেশে ছিল বিদেশী সাহেবের বাংলো। হ্যামিলটন কোম্পানীর সেই বিদেশী মালিক দূর ইংল্যাণ্ড থেকে এসে আবিষ্কার করেছিলেন দূর দুর্গম সমুদ্রতীরের ছোট্ট এই শান্ত সমুদ্র সৈকতকে।

তখন বেলদা স্টেশন থেকে দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ মাইল পথ ঘোড়ার পিঠে এসে আজকের এই রূপময়া দীঘাকে আবিষ্কার কবেন। ভালো লেগে যায় এঁর নির্জনতাভরা সমুদ্রের পরিবেশ; ঝাউবন. কাজুবাদামের সবুজ বিস্তার, ওই বালিয়াড়ির উপরেই বাংলো বাগান তৈরী করিয়ে নেন।

পরবর্তীকালে নিজের ছোট্ট টাইগার মথ প্লেনে এসে নামতেন দীঘার সমুদ্রের বিচে, শনিবার রবিবার ছুটির দিনগুলোয় দীঘা তাকে টানতো।

শেষ বয়সেও আর ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাননি, দীঘাতেই কেটেছে তার শেষ জীবন। বাংলোর বাগান থেকে চেয়ে থাকতেন নীল সফেন সমুদ্রের দিকে। ওর ওই প্রান্তে কোথায় তার দেশ। সেই দেশেও যান নি। এইখানেই থাকতেন।

সেই বিদেশীর শেষ নিঃশ্বাস পড়েছিল এখানেই।

আজও সেই বাগানের মধ্যে রয়েছে তার সমাধি, এখান থেকে

সমুদ্রের রূপ আজও ফুটে ওঠে এই শান্ত পরিবেশে।

···হঠাৎ খেয়াল হয় মিনতির।

বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। দীঘার সমুদ্রে তখনও আকাশের শেষ আলোর রংবাহার জেগে আছে। পাখিরা ফিরছে শান্ত বাগানের গাছ-গাছালিতে। বহুদিন থেকেই ওরা এসময় ঘরে ফেরে।

মিনতি বলে—সন্ধ্যা হয়ে গেল। মা ভাববে, কেনাকাটাও বাকী।

···মিনতি বৈকালে কেনাকাটা করতে বের হয়েছিল। পথে দেখা হয়ে যায় সমরের সঙ্গে। ওরা এসেছিল এই শান্ত পরিবেশে দীঘার অতীত ইতিহাসের কিছুটা শেষ চিহ্নকে দেখতে।

সমর বলে—এমন কিছু রাত হয় নি। চলুন, বাজার সবে বসছে।

—তাহলে দীঘায় এসে ক'দিনের জন্য ঘর-সংসার পাতলেন?

মিনতি আর সমর টিলার নীচে এসে গেট পার হয়ে বাইরে আসবে হঠাৎ কাদের কলরবে চাইল।

শান্ত নির্জন পরিবেশে ওই কলরবটা বেমানান বোধ হয়, বাংলোর বারান্দায় কোন বৌ মেয়ে, দু'একজন লোক মালপত্র পুঁটুলি বিছানার বাণ্ডিল নিয়ে ঢুকে শান্ত এই পরিবেশটিকে তছনছ করে হাঁক পাড়ে।

—চৌকিদার? এ্যাই চৌকিদার? মালপত্তর তুইলা দাও। এ্যাই পুঁটি, বাগানের ফুল বেশি ছিঁড়িস না।

সেই বিদেশীর শান্ত সুন্দর বাংলো আজ কাদের ঘিঞ্জি ভিড় আর কলরবে ভরে উঠেছে। কোন ভদ্রমহিলা কোলের বাচ্চাটাকে কি কারণে দু'চার ঘা দিতেই সেও চিল-চিৎকার-এ তীক্ষ্ণ সাড়া তুলে কাঁদছে।

মিনতি চাইল।

ওদিকে বালিয়াড়িতে সমাধিবেদীর উপর একটা আলো জ্বলছে। মিনতি বলে—ভদ্রলোক তখন শান্তিতে থাকতেন। এখন?

সমর বলে—এই বাংলো এখন নাকি বিদ্যুৎপর্ষদের হলিডে হোম হয়েছে। এটা তাদেরই দখলে। এখানে তাদের স্টাফরা সপরিবারে

বিশ্রাম নিতে আসে। কঠিন পরিশ্রম, তাই বিশ্রামের দরকার।

ওরা বের হয়ে এল পথে।

শান্ত ঝাউবনের মর্মর ছাপিয়ে তখন কলরব-হাঁকডাক চিল-চীৎকার সমানে চলেছে এই জগতের স্তব্ধতাকে খান্ খান্ করে।

দীঘার রূপ আজ বদলেছে।

পুরোনো ঝাউবন, বালিয়াড়ি সব আজ সমুদ্রের ভাঙ্গনে চলে গেছে। দীঘার সমুদ্র এসে হানা দিয়েছে সহরের নীচেই। সেই প্রশস্ত বেলাভূমিও আজ অবলুপ্ত। টাইগার মথ: প্লেন নামবার উপায় নেই।

জোয়ারের সময় ছোট্ট বেলাভূমি ডুবিয়ে জলরাশি ঢেউ-এর মাথায় লাফ দিয়ে এসে নীচে পাথর-ফেলা বাঁধে আছড়ে পড়ে।

বেলাভূমি যা আছে তা দূরে সহরের এলাকার বাইরে।

তবু যাত্রীর অভাব নেই।

বহু যাত্রী-বোঝাই বাস সকালে আসে। যাত্রীরা এখান-ওখানে ঘুরে সমুদ্রস্নান করে কোনও হোটেলে না-হয় নিজেরাই চড়ুই-ভাতির মত রান্নাবান্না করে খায়, আবার রাতে বাস ছেড়ে চলে যায়। এ ছাড়া আশ্রয় নিয়েও থাকে অনেক যাত্রী।

বাঁধা বাজার।

চারিদিকে দোকানপত্র, ঝিনুকের তৈরি করা নানা খেলনা-মূর্তি শঙ্খ, আর মেদিনীপুরের মাদুর, মাদুরের তৈরি আসন—নানা কিছুর দোকানও রয়েছে।

সাজানো রেস্তোরাঁরও অভাব নেই, আর টিনের শেড-করা—মুড়ি-গোলগাপ্পা-আলুকাবলি, তেলেভাজার দোকানও জমেছে অনেক।

সমুদ্রের ধারে নিওন আলো জ্বলছে তার আভা পড়েছে ঝাউবনে, সমুদ্রের জলে। অনেকেই বসে আছে বাঁধের উপর।

শীতের মুখ। হিম জোলো হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে। সমুদ্রের বুকে দেখা যায় নৌকা ও লঞ্চের জটলা। দু'চারটে আলো জ্বলছে মিট মিট করে।

এ জগৎটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানে সাধারণ যাত্রীদের ভিড় কলরব নেই। দোকানদারদের গ্যাসবাতি জ্বালা কলরবও পৌঁছায় না।

সমুদ্রের ধারে নির্জন ঝাউবনের প্রহরা ঘেরা বড় বাড়িটায় আলো জ্বলছে। সামনে নিওন সাইনের ঝকমকানি, গেটে উর্দিপরা দ্বারোয়ান। একদিকে পাঁচীল ঘেরা সাজানো বাগানে ডালিয়া-ক্রিসানথিমাম, বিরাট সাইজের গাঁদা ফুল-এর বাহার।

হোটেল 'সিকিং'-এর এই জগতের সঙ্গে বাইরের কলরবমুখর মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের বিশেষ সম্বন্ধ নেই।

বিরাট বাড়িটার পিছনেও ব্যাডমিন্টন কোর্টে আলো জ্বলছে, বাগানের মধ্যে সাজানো কোর্টে কয়েকটি মেয়ে জিন্স পরে ফ্লাড-লাইটের আলোয় ব্যাডমিন্টন খেলছে। ওদের স্বাচ্ছচার দেহের রেখা-গুলো মুখরতর হয়ে ওঠে. আকাশে ডানা মেলে উড়ে চলেছে ওদের র‍্যাকেটের ঘা-খাওয়া শাটল্-কক্‌টা—সুরেলা গলায় চীৎকার ওঠে।

বাগানে দু'চারটে গার্ডেন আমব্রেলার নীচে কিছু অতিথি সামনের বার থেকে সফেন বিয়ার-এর মগ্ নিয়ে এসে বসেছে। ওরাও উৎসাহিত করে খেলোয়াড়দের।

—স্ম্যাস্ জুলি! ইন্ সোনি—ভেরি গুড !

বাদল রায়-এর বিয়ারে ঠিক মেজাজ আসেনা, তাই হুইস্কি নিয়ে বসেছে। লতিকাও বসেছিল। তার একটু আগে লতিকা বৈকালে ঘুম থেকে উঠে সেজেগুজে নিয়েছে। এ হোটেলের অতিথিদের মধ্যে যেন অলিখিত বিউটি-কনটেস্ট একটা হয। প্রতি সন্ধ্যায় সাজানো লাউঞ্জে এসে বসে অনেকেই। সমুদ্রের উপরই হোটেলটার দোতলায় তিনদিকে কাঁচ ঘেরা সুন্দর লাউঞ্জ।

হোটেল কর্তৃপক্ষ এখানে একটা টেলিভিসন সেটও রেখেছে। কোনরকমে এ্যানটেনা-বুস্টার দিয়ে ওটা লাগানো হয়েছে, কলকাতা স্টেশন থেকে ছবি খানিকটা আসে কোনমতে, কিন্তু ছবি দেখার চেয়ে হোটেলে যে টি-ভি সেট আছে এই পদমর্যাদার সামাজিক স্বীকৃতির জন্যই

ওটা রাখা হয়েছে। আর অনেকেই এসে বসেন এখানে।

কেউ উল বোনে, কেউ দেখে অপরের শাড়ি-মেক্‌আপের স্টাইল, স্কার্ফ-এর ডিজাইন। কেউবা গিন্নীকে এখানে বসিয়ে রেখে বারে গিয়ে আড্ডা জমায়।

লতিকা তবু চেষ্টা করে স্লিম হতে। তাই ডায়েটিং করে। আজ সন্ধ্যায় ব্যাডমিণ্টন কোর্টে নেমেও দু'পাঁচ মিনিট দৌড়াদৌড়ি করার চেষ্টা ক'রে এই শীতেও গলদঘর্ম অবস্থায় গিয়ে বসেছে গার্ডেন-আমব্রেলার নীচে।

বাদল রায় তখন তিন পেগ শেষ করে চতুর্থ পেগ নিয়ে বসেছে। সবে গোলাবী নেশাটা জমে উঠেছে। লতিকাকে এসে বিরাট দেহ নিয়ে কোলাব্যাঙের মত থপ্ করে বসে পড়তে দেখে চাইল সে।

—হ্যাল্লো ডার্লিং?

লতিকা হাঁপাচ্ছে। বলে সে—ফিলিং টায়ার্ড আজ বাসে এসে খুব কষ্ট পেয়েছি।

বাদল বলে—গাড়ি কালই এসে যাবে। গাড়ি নাহলে বেরুতেও পারছিনা।

ঘামে লতিকার মুখের রং গলছে, ঠোঁটের লাল রং যেন জ্যাবড়া হয়ে গেছে। লতিকা বলে।

—আমি ফ্ল্যাটে যাচ্ছি। বেশি খেওনা কিন্তু।

হাসে বাদল রায়—না, না।

লতিকা চলে গেল। বাদল রায় ঘড়ির দিকে চেয়ে একটু নিশ্চিন্ত হয়। লতিকা আর নামবে না, কারণ দোতলায় ওঠার ধকল সামলাতেই তার সময় যাবে। ঘরেই কিছু দুধ আনিয়ে খেয়ে সে শোবে। এবার বাদল রায়ের ছুটি।

মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠে বাদল, অতীতের সেই কর্মঠ-লোভী-কেরিয়ারিস্ট তরুণটি। লতিকার জন্যই সব পেয়েছে সে। অর্থ-প্রতিষ্ঠা, ওই কারখানার মালিকানা সবকিছু। কিন্তু তার বিনিময়ে বাদলের হারিয়ে গেছে অনেক কিছু।

শান্তি সে পায়নি।

হাঁপিয়ে উঠেছে ওই টাকার বস্তার বোঝা বয়ে বয়ে, মাঝে মাঝে তাই ক্ষেপে উঠতে চায় বাদল রায়, মরীয়া হয়ে উঠে সামনে যা কিছু পায় তাই ভোগ দখল করতে চায় লোভী একটা জানোয়ারের মত। এই তীব্র বঞ্চনার প্রতিশোধ নিতে চায় এই ভাবেই।

ঘড়ির দিকে চাইল। রাত্রি সাতটা বেজে গেছে, কলকাতায় সবে সন্ধ্যা। কিন্তু কর্মহীন এই দূর নির্জনে ছুটির শান্ত পরিবেশে এই সাতটাই যেন অনেক রাত্রি।

…কাজল আর রমেন এসে উঠেছে সমুদ্রের ধার থেকে গ্রামের ভিতরের দিকে চলে গেছে তেমনি একটা রাস্তার ধারে নোতুন হোটেলে। দীঘা নোতুন করে গড়ে উঠছে, আশপ্পাশেও বাড়ছে তার বাড়িঘরের সীমানা। নোতন দু'তলা বাড়ি—বাজারের কলরব এখানে নেই, সামনে একটা বালির পাহাড়, নীচে নিম্নভূমিতে বর্ষার জল জমে-জমে ছোটখাটো লেকে পরিণত হয়েছে। পিছনে দু'একটা পুরোনো গাছ গাছালি রয়েছে।

তবু ভালো লাগে জায়গাটা কাজলের, দোতলা থেকে সমুদ্র দেখা যায়।

দুপুরে পৌঁছে স্নান-খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিতে গিয়ে প্রথম অবাক হয় কাজল।

খাওয়াটা ভালোই হয়েছে। রমেন সেদিকে বেশ দিলদরাজ। ভাত, ডাল, ভাজা-তরকারী, সমুদ্রের ইয়াবড় সাইজের পারশে আর তাজা ইলিশের ঝাল।

কলকাতায় মাছ তাদের জোটে সপ্তাহে দুদিন বড়জোর। তাও বরফের মাছ, নাহয় ত্যালাপিয়া গোছের কিছু, আর ভাগেও পড়ে একটা টুকরা মাত্র।

রমেন বলে—টাটকা মাছভাজা থাকে তো দিন।

কাজল হাসে—এইতো মাছ রয়েছে, আর কি হবে?

রমেন শোনায়—উইদাউট বরফের মাছ কলকাতায় পাবে না। এর টেষ্ট-ই আলাদা। নাও।

শেষপাতে দই সন্দেশ।

কাজল স্নান সেরে পিঠে মেলে দিয়েছে একরাশ চুল, মুখে চোখে সতেজ কমনীয়তা। রমেন এই কাজলকে আগে দেখেনি। কাছাকাছি থাকলে মানুষের সত্যিকার রূপটা পরস্পরের কাছে ধরা পড়ে। রমেন তাই যেন নিজের স্বরূপটাকে প্রকাশ করতে চায় না।

খাওয়াদাওয়ার পর উপরে এসে বিশ্রাম নিতে গিয়ে অবাক হয়েছে কাজল। তার কুমারী মনের অতলে ভয়টা নীরব ছিল। কোন পুরুষের এত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে সে আসেনি। রমেনকে দূর থেকেই দেখেছিল। দু-চারদিন সন্ধ্যায় বেড়াতে গেছে, ছবি দেখতে গেছে ওই পর্যন্তই।

একঘরে রাত্রি বাস করার কথা ভেবে অজানা ভয়ে শিউরে উঠেছিল কাজল। কিন্তু উপরের ঘরে এসে ব্যাপারটা দেখে নিশ্চিন্ত হয়। খুশিও হয়েছে সে।

একটা ঘর, ওদিকে একটা ঢাকা বারান্দা, পর্দা ফেলার ব্যবস্থা আছে। অন্যদিকে বের হবার দরজাও আছে ছাদে।

রমেন বলে—কাজল, তুমি ঘরের মধ্যে থাকবে, আর ওই ঢাকা বারান্দায় ক্যানভাসের পর্দা ফেলে দিব্যি থাকবো আমি।

দুপুরে ওই ভাবেই রয়েছে তারা।

কাজল দরজাটা বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হয়, রমেনের উপর বিশ্বাসটাও বাড়ে। মনে হয় রমেন সত্যিই ভালো।

নাহলে অনেক বইয়ে পড়েছে এইভাবে মেয়েদের চরম সর্বনাশ ঘটায় অনেকে। কাজলের মনে হয় রমেন তাদের দলের নয়।

সকালের ক্লান্তির পর স্নান আহার করে বেশ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়েছে কাজল।

…কলকাতার বদ্ধ ঘরে দুপুরে মা-বাবা ভাইবোনদের কথার শব্দ, বাইরের কলরব, কলতলায় পাবলিকের তারস্বরে ঝগড়া চলেছে—কাজলের ঘুমটা কার ডাকে ভেঙে যায়।…

চাইল সে।

কলকাতার সেই ঘিঞ্জি ঘরটায় সে নেই। জানলার বাইরে ভাঙা প্রাচীরে দৃষ্টিও আবদ্ধ হয় না, ক্রমশ ভাবতে পারে। সে এসেছে দীঘার সমুদ্রতীরে বেড়াতে।

জানলা দিয়ে সবুজ ঝাউবন—কল্লোলমুখর সমুদ্র দেখা যায়। বালি-চরে দেখা যায় রঙীন পোশাক পরা যাত্রীদের, ভ্রমণার্থীদের ভিড়। বাতাসে ওঠে সমুদ্রের কলগর্জন।

রমেন চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে ডাকছে।

কাপড়চোপড় ঠিক করে খোলা চুলগুলো জড়াতে জড়াতে দরজা খুলে দিতে রমেন চায়ের গ্লাস দুটো নামিয়ে বলে।

—কি ঘুম রে বাবা? ঢাক বাজিয়ে ঘুম ভাঙাতে হবে! নাও, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

কাজল বলে—সত্যি! ওই খাওয়ার পর দারুণ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। চলো, চা খেয়ে একটু বেড়াতে যাবো কিন্তু।

রমেন বলে—তাহলে তৈরী হয়ে নাও। অন্ধকার নামলে আর কিছু দেখা যাবেনা।

ওরা দুজনে বের হয়েছে।

কাজলের চোখে খুশির আভাস। এমনি খোলামেলা জগতে এই সমুদ্র, ঝাউবনের বিস্তার দেখে খুশিতে সে ফেটে পড়ে। চঞ্চলা কিশোরীর সজীব কৌতূহল ওর মুখে চোখে।

কাজল বলে রমেনকে—চুপ করে আছো যে? এ্যাই!

রমেন কি ভাবছে। বার বার তার মনে একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের নীরব সংঘাত চলেছে। সে ভাবছে কথাটা। মাঝে মাঝে কাজলকে দেখে মনে হয় রমেনের একটা স্বপ্নের কথা। সুন্দর সার্থক স্বপ্ন, কিন্তু পরক্ষণেই দুর্বার একটা ঝড় যেন তার সব স্বপ্ন সবুজের স্নিগ্ধতাকে ছারখার করে দেয়।

কাজলের কথায় চাইল রমেন।

বলে সে—কই না তো! মানে—সমুদ্রের বুকে সূর্যাস্ত দেখছি। সত্যি

এমন সূর্যাস্ত কোলকাতায় দেখা যায় না।

সমুদ্রের বুকে মেঘ-ভাঙা শেষ সূর্যের আলো বেগুনী, উজ্জ্বল হলুদ, গোলাপী আভা দিয়ে সমুদ্রের নীল জলরাশিকে রঞ্জিত করেছে।

বাস থেকে নেমে সীমা আর নিমাই এসে উঠেছে ট্যুরিস্ট লজে।

সামনে তিনতলার ব্যালকনি থেকে দেখা যায় দীঘার বাজারের কিছুটা, তার পরই সমুদ্র। বিরাট এলাকা নিয়ে ট্যুরিস্ট লজের তিনতলা বাড়িখানা দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে ডাইনিং হল্। সামনে কিছুটা বাগান। সরকারী মালি ডিউটি করে মাত্র বাগানে, ফুল ফোটানোর কথা তার নয়। তাই কিছু গাছগাছালি রয়েছে মাত্র। বাকী নুড়ি-ছড়ানো জায়গায় কিছু ক্যাক্টাস-এর ভিড়। ওদের যত্ন বিশেষ না করলেও চলে, বনবাদাড়ের ফণিমনসা, তেশিরা কাঁটার জঙ্গল সাহেবদের এলাকায় এসে যেন জাতে উঠেছে।

নিমাইদের মাছের ব্যবসা। কলকাতার আশপাশে ওদের পৈতৃক ভেড়ি আছে, বাবা-ঠাকুর্দার আমলের দক্ষিণের বাদায় এখন আড়বাঁধ দিয়ে ওরা মাছের চাষ করে। কলকাতার পাইকেরী বাজারে সে মাছ আসে। নিমাই আর ওর দুই দাদা মিলে ব্যবসা দেখে।

নিমাই-এর বুদ্ধিটা ব্যবসায়ে ভালোই স্যুট করেছে। সেও আলাদা করে মাছ কেনাবেচা করে। দীঘার মহাজনরাও কলকাতায় তাদের আড়তে মাছ চালান দেয়। নিমাই এসেছে যদি সে এখানে কোন আড়ত খুলতে পারে, ব্যবসাতে লাভটা অনেক বেশি থাকবে সেই আশায়।

সীমাকে নিয়ে বের হয়েছে নিমাই।

সীমা চুপচাপ দেখছে দীঘার বাজার, জনতার ভিড়। নিমাই বলে,

—চলো, বীচ ধরে ওই দিকটা ঘুরে আসি।

ভাঁটার সমুদ্র, জল বীচ থেকে দূরে সরে গেছে। সমুদ্রের বুকে অসংখ্য নৌকার ভিড়। ছোট বড় নৌকা-লঞ্চও রয়েছে। দূর সমুদ্রে কালো বিন্দুর মত নৌকার সারি দেখা যায়। ওরা দুজনে এগিয়ে চলেছে বালিয়াড়ি ধরে।

একটু দূরেই বীচ এখানে অনেক প্রশস্ত।

সেই বালিয়াড়িতে গড়ে উঠেছে সারবন্দী বহু চালা। সীমা শুধোয়।

—ওসব কি? লোকজন যাচ্চে ওখানে? আর সমুদ্রে এত নৌকা-লঞ্চ কি হয়?

হাসে নিমাই, বলে সে —ওসব সমুদ্রে মাছমারাদের নৌকা-লঞ্চ। আর দূরে ওইসব ঘর দেখছো ওটা মাছের বাজার। চলো না?

সন্ধ্যা নামছে। সীমার এত কৌতূহল নেই। দীঘার সমুদ্রতীরেও দু'চারটে পোস্টে আলো জ্বলে উঠেছে। জোলো হাওয়ায় ঠাণ্ডার আভাস জাগে। সীমা বলে—সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ওদিকে ফাঁকায় নাই বা গেলে।

নিমাইয়ের দরকার ওখানে। কারণ মাছের মহাজনদের সন্ধ্যার পর তেমন কাজ থাকে না। তখন নৌকা-বহর লঞ্চে বেঁধে নিয়ে জেলেরা সমুদ্রে চলে গেছে। মাছ ধরবে সারা রাত, মাছ নিয়ে ফিরবে সকালের দিকে।

সীমার কথায় নিমাই একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে।

—তোমার ওই কথা! বেড়াতে এসেও বেড়াবে না। এতই যদি ঠাণ্ডার ভয়, চলো তোমাকে ট্যুরিস্ট লজে রেখে আসি। ওখানে আমাকে একবার যেতেই হবে। চলো—

সীমা বলে—আমি একাই টুরিস্ট লজে ফিরতে পারবো। ওই তো দেখা যাচ্ছে বাড়িটা। তুমি বরং ওই জায়গা থেকে ঘুরে এসো।

নিমাই ক্ষুণ্ণস্বরে বলে—ঠিক আছে!

সে হন্ হন্ করে ঝাউবনের ধার দিয়ে বাঁধের রাস্তা ধরে এগিয়ে যায়।

জনকোলাহলে এই ভ্রমণার্থীদের ভিড়ে একা দাঁড়িয়ে আছে সীমা। ট্যুরিস্ট লজেও ফিরতে ইচ্ছা করে না। ওদিকের বাঁধের উপর একটা পাথরে বসে সামনে রাতের সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকে। সমুদ্রের বুকে জোয়ারের সাড়া জাগছে। ঢেউগুলোর শান্ত রূপ এবার কি উত্তেজনায় ফুঁসে উঠছে, লম্বা টানা ঢেউটা সগর্জনে ফুঁসে উঠে কি প্রচণ্ড আঘাতে খান্ খান্ হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে অসহায় নিষ্ফল গর্জনে!

এ যেন সীমার মতই ব্যর্থ সে।

নিমাইয়ের সঙ্গে বিয়েতে তার অমতই ছিল। কিন্তু সেই অমতটাকে প্রকাশ করতে পারেনি। বার বার মনে পড়ে সীমার হারানো দিনগুলোর কথা, বিজনের কথা।

বিজনের বাড়িও ছিল মেদিনীপুরের দীঘার কাছাকাছি কোন জায়গায়, সেও বলতো দীঘার কথা। পাস করে এদিকেই কোন স্কুলের শিক্ষকতার কাজ পেয়ে যায়। সেদিন সীমার আর উপায় ছিল না। মেছো ভেড়ির মালিকের পুত্র নিমাই তখন তার স্বামীতে পরিণত হয়েছে, সীমার মা আর দাদাদের চাপে পড়ে সীমাকে এই মানুষটাকে মেনে নিতে হয়েছিল।···

নিমাই তখনও ফেরেনি। সীমা একাই বসে ছিল। ঠাণ্ডা লাগছে। পথ-ঘাটে তখনও উৎসাহী ভ্রমণকারীদের ভিড় রয়েছে। পথের দুপাশে দোকান সাজিয়ে বসে আছে মাদুরওয়ালারা, ঝিনুক-শাঁখের দোকানীর দল। চুটিয়ে ঝালমুড়ি বিক্রী হচ্ছে।

ওদিকে ঝাউবনে রাত্রির অন্ধকার নেমেছে। বেশ খানিকটা নিরিবিলি পথ, দুচারটে আলো জ্বলছে। এখানে ভিড় তত নেই। সীমা ফিরছে।

হঠাৎ ওই আলোর আভায় কাকে দেখে চমকে ওঠে সীমা। না, চিনতে সে ভুল করেনি।

ওই তরুণটিকে সে চেনে। তাকে এখানে দেখবে ভাবেনি। অস্ফুট কণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে সীমা—বিজন!

ছায়ামূর্তিটা দাঁড়ালো, ফিরে চেয়ে সেও অবাক হয়েছে। তার দুচোখে বিস্মিত চাহনি ফুটে ওঠে। বিজন এগিয়ে এসে দেখছে সীমাকে। এ নোতুন কোন্ সীমা! সীমন্তে সিন্দুর, পরনে ঢাকাই শাড়ি। এই সীমাকে দেখে আজ বিজনের মনে হয় সবই তার চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে। এটা জানতো সে, তাই বোধহয় কলকাতা থেকে সরে এসেছিল কাউকে কিছু না জানিয়ে।

কিন্তু এখানে এইভাবে সেই সীমার মুখোমুখি হয়ে যাবে তা ভাবেনি বিজন।

সীমা দেখছে ওকে। তার সন্ধানী চোখে বিজনের পরিবর্তনটা ধরা

পড়ে। বলে সে—শরীর খারাপ হয়ে গেছে।

হাসল বিজন। জানায় সে—শরীরের দোষ কি বলো? তুমি ভালো আছো তো?

সীমা যে ভালো আছে, সুখী হয়েছে তার চিহ্ন ওর পোশাকে, সীমন্তের সিন্দূররাগে আর ঢাকাই শাড়ির ঔজ্জ্বল্যে। সীমার কাছে এটা যেন অর্থহীনই বোধ হয়।

চুপ করে থাকে সে।

বিজন শুধোয়—তা বেড়াতে এসেছো বুঝি? কর্তাকে দেখছি না? সীমাকে যেন বিজন কি বলতে চায়। হয়তো ব্যঙ্গই করছে। সীমাই শেষদিকে তাকে অবজ্ঞাই করেছিল, কিন্তু সীমার মনের অবস্থাটা বোঝার মত মানসিকতা তখন ছিল না বিজনের।

সীমা বলে—ট্যুরিস্ট লজে উঠেছি। তুমি?

বিজন বলে—সখ করে বেড়াতে আসার মত প্রাচুর্য আমার নেই সীমা, গরীব স্কুলমাস্টার, সে চাকরীতেও দীর্ঘ ছুটি নিয়ে এসেছি—রয়েছি নোতুন দীঘার ওদিকে একটা গ্রামের ঝুপড়িতে। ম্লান হেসে বিজন বলে—স্বেচ্ছানির্বাসনও বলতে পারো। যাই, রাত্রি হয়ে গেছে। ক'দিন আছো?

সীমা বলে—থাকছি দু'চার দিন।

শেষ কথাটা বোধ হয় শুনতে চায়নি বিজন, পথচলতি একটা রিক্সাকে ডেকে উঠে পড়েছে। রিক্সাওয়ালাকে বলে।

—নিউ দীঘার ওদিকে রতনপুর চলো।

চলে গেছে বিজন। তখনও দাঁড়িয়ে আছে সীমা।

মনেহয় বিজন তাকে ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেল। হয়তো আজ তার কাছে সীমার কোন মূল্যই আর নেই। সীমার মনে হয় তার অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে। সীমা একাই ফিরছে ট্যুরিস্ট লজের দিকে।

সমুদ্রের ধারে তখন টেপ-রেকর্ডারে ডিস্কো দিওয়ানা বাজছে। বেশ জোর জোর বাজছে উত্তাল সুরটা, আর পটলার দল সেই সুরে

ঘুরে ঘুরে নাচছে ডিস্কো নাচ।

ওদের হাততালির উদ্দাম শব্দ উঠেছে; সান্টু, পটলা আর ক'জনে নাচছে আর অতি উৎসাহী কিছু দর্শকও ভিড় করেছে।

সীমা চলেছে বেদনার্ত মন নিয়ে ট্যুরিস্ট লজের দিকে। বাইরের জগতের এই আনন্দ কলরব, মুক্তির উদ্বেল প্রকাশ তার মনে কোন সাড়াই আনেনি। বারবার বিজনের শীর্ণ মুখখানা তার চোখের উপর ভেসে ওঠে। সীমার মনে হয়, সে ওই সহজ একটি তরুণকে অকারণেই আঘাত করেছে সব থেকে বেশি।

ভবতারিণীর বাতের ধাত। সন্ধ্যার পর জোলো হাওয়া ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ভবতারিণী সমুদ্রের ধার, বাজার, ঝাউবন একটু ঘুরে যেন হতাশ হয়েছে। কি দেখতে দীঘায় এত লোক আসছে?

মিনতি বলে—কেন, বেশ ফাঁকা সমুদ্রতীর কত সুন্দর।

—ছাই! ভবতারিণীর এসব নজরে লাগেনি, বলে সে।

—এইতো সবে একমুঠো জায়গা, রাজ্যের মানুষ যেন হামলে পড়েছে এখানে। তা ঠাকুর-দেবতার মন্দিরও নেই?

সমর একাই ঘুরছিল, এদের দেখে এগিয়ে আসে।

ভবতারিণী চিনেছে ছেলেটিকে। এক বাসেই এসেছিল তারা।

সমর শুধোয়—কটেজে রয়েছেন, কোন অসুবিধা হয়নি তো?

ভবতারিণী বলে—দেখা হয়ে ভালোই হ'ল বাছা। অসুবিধে হচ্ছে না আবার? ইলেকট্রিক লাইন আছে, বাতি জ্বলছেনা। বলে, মিস্ত্রীর ছুটি। অন্ধকারেই রয়েছি বাবা। মোমবাতি কিনতে এসেছি।

সমর বলে—ফিউজ বদলাবারও লোক নেই? চলুন, দেখছি।

ভবতারণী বলে—তাই দ্যাখো বাবা। আর মিনুকে বলছিলাম, ঠাকুর-দেবতা কি নেই এখানে? মন্দির-টন্দির?

মিনতি সলজ্জভাবে বলে—মায়ের ওই এক কথা! এখানে ঠাকুর-মন্দির পাবে কোথায়?

সমর বলে—না না, আছে। খুব জাগ্রত দেবতা। একেবারে

পাতালফোঁড় মহাদেব। সারা দেশে ওঁর মাহাত্ম্য ছড়ানো। চন্দনেশ্বর শিবের নাম শোনেননি ?

ভবতারিণী দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে আগেভাগে নমস্কার করে বলে —জয় বাবা চন্দনেশ্বর! দ্যাখ মিনু, সমর সব খবর জানে। এখানে আসে-টাসে কিনা। তা বাবা, একদিন দর্শন হবে না ?

সমর বলে—তা হতে পারে, তবে মাসীমা, একটু দূর কিনা। বাংলার বর্ডার পার হয়ে উড়িষ্যার মধ্যে ওই মন্দির। যেতে আসতে একটু সময় লাগবে। কিছুটা রিক্সায় না-হয় বাসে গিয়ে হাঁটতে হবে।

ভবতারিণী বলে—তা হোক বাবা। এতদূর এসে এহেন দেবতাকে দর্শন, প্রণাম করে যাবোনা তা কি হয় ? কি রে মিনু ?

মিনতি মায়ের এই দেবতার ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়িটাকে ঠিক পছন্দ করে না। বিরক্তিভরেই বলে সে।

—ওই মন্দিরের পথঘাট আমি চিনি না বাপু, তাও বাংলা মুলুকে নয়, ভিন প্রদেশের মধ্যে।

ভবতারিণী বলে—তাতে কি হ'ল ? লোকে শুধিয়ে হিল্লী-দিল্লী যায় —এ তো কোন ছার! তা হ্যাঁ বাবা সমর, তুমিই না হয় একদিন নিয়ে চলো আমাকে।

সমর চাইল মিনতির দিকে। মিনতি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্য সমর বলে।

—ওকথা পরে হবে। চলুন মাসীমা, দেখিগে আপনার আলো-জ্বালানোর কিছু করা যায় কিনা।

কাজল খুশিতে ফেটে পড়ে।

বাঁধের উপর তখন ওই ছেলের দল ডিস্‌কো নাচ সুরু করেছে। পটলার পরনে চুষ-প্যান্ট, কোমরে চওড়া পেতলের কড়া লাগানো চামড়ার বেল্ট, মাথায় কাকের বাসার মত উস্কোখুস্কো চুল।

সিটি দিয়ে, কোমরখানাকে লিকলিকিয়ে সারা দেহ ঘুরিয়ে পাক খেয়ে নেচে চলেছে। সান্টু সিটি বাজায়—দারুণ গুরু! টপ্!

রমেনের ভালো লাগেনা এসব।

কাজলকে ডাকে সে—চলে এসো।

কাজল ঝাল-মুড়ি খেতে খেতে দেখছিল ওদের নাচ। রমেনের দিকে চেয়ে বলে—দারুণ নাচছিল কিন্তু।

রমেনও কয়েক বছর আগে ওদের মতই ছিল। পাড়ার বারোয়ারী পূজার পাণ্ডা হয়ে নাচতো দল বেঁধে বিসর্জনের সময়, আর ক্রমশ বাজারের ব্যাপারীদের কাছে ধমকে টাকা তুলতে শুরু করে, ছুতোয়-নাতায় বোমা টপকাতো। ক্রমশ পাড়ার মস্তান হয়ে ওঠে।

এসময়ই ভোট এসে গেল, রমেন রাতারাতি কোন রাজনৈতিক দলের ধ্বজাধারী হয়ে সমাজসেবকের ভূমিকায় নেমে পড়লো, মিটিংয়ে শান্তিরক্ষার ভার তার দলের উপর। বিনিময়ে টাকা পায় সে। অন্য-দলের মিটিং বানচাল করে দাও বোমা টপ্‌কে, ব্যাস্ তাতেও টাকা।

…রমেন ক্রমশ প্রকাশ্যে ওই নাচানাচি বন্ধ করে দিয়ে একটু উপরের থাকে উঠে গেল, অবশ্য নাচতো এখন তার দলের জনিয়ার এ্যাপ্রেনটিস ছোকরারা।

রমেনের এখন অন্য কাজ রয়ে গেছে। দলের কিছু ছেলের চাকরী হবে -বিনিময়ে সে পাবে তাদের কাছ থেকে মাসে মাসে কিছু টাকা। ওটা হবে তার মাসিক রোজগার, তাছাড়াও কাজ হাসিল করতে পারলে একসঙ্গে পাবে হাজার পাঁচেক টাকা নগদ।

…অবশ্য তাতে ক্ষতি তেমন কিছু হবেনা। আজকাল ঘরে ঘরে এমন সব কাজ আকচারই হচ্ছে। কাজলও হয়তো একটা চাকরীই পেয়ে যাবে।

রমেন ঘড়ির দিকে চাইল। তাকে এবার যেতে হবে কাজের ব্যাপারে। বলে সে—চলো কাজল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। হোটেলে চলো।

সমুদ্র, ওই লোকজন,—কাজল তাদের মধ্যে যেন কি মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। বলে সে—এর মধ্যে হোটেলে ফিরতে হবে?

রমেন বলে—কাল ভোরে আবার বের হবো। চলো, হোটেলে তুমি একটু থাকবে, আমি ঘুরে আসবো কাজ সেরে।

বাদল রায় কয়েক পেগ গিলে এখন বেশ মেজাজে এসেছে। ঝাউ-বনে রাতের হাওয়া সাড়া তুলছে, আছড়ে পড়ে ঢেউগুলো। বাদলের চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই মেয়েটির কমনীয় মুখ চোখ, টসটসে মুখখানা। দেহের সোচ্চার রেখাগুলোয় যৌবনের প্রকাশ।

বাদল রায় নিজের স্ত্রীকে নিয়ে সুখী হতে পারেনি।

লতিকার অর্থ-প্রতিষ্ঠা সবকিছুর বোঝাটা ক্রমশ বাদল রায়ের জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে। তাই ভোগ-লালসাই বেড়ে উঠেছে তার। টাকার অভাব নেই, টাকা দিয়েই বাদল রায় এখন সবকিছু কেনে, আর তার সেই রসদ যোগাতেও লোকের অভাব হয় না।

…পায়ের শব্দে চাইল বাদল রায়।

—নমস্কার স্যার!

বাদল রায় ওই রমেনের পথ চেয়েই ছিল। কথা ছিল রমেন শিকার-টাকে জালে ফেলে এখানে আনবে। তারপর কৌশলে বাদল রায়ের হাতে তুলে দেবে। রমেন বাদল রায়ের কাছে নানা ভাবে বাঁধা। তার কারখানা থেকে শ্রমিক আন্দোলনের নেতা সেজে শ্রমিকদের ছলে বলে কৌশলে ঠাণ্ডা করে রেখে টাকা পায়, দরকার হলে তুনম্বরী মালও রাতের অন্ধকারে ট্রাকবন্দী করে দলবল নিয়ে পাহারা দিয়ে ডেরায় পৌঁছে দেয়।

সেবার কোন শ্রমিকদল জোট বেঁধে কাজ বন্ধ করেছিল। কয়েকদিন পর তাদের নেতার মৃতদেহটা পাওয়া গেল ঝিলের ধারে। আন্দোলন থেমে গেল। অবশ্য বাদল রায় নিহত শ্রমিকের পরিবারকে তুহাজার টাকা দিয়েছিল, কিন্তু তার হত্যাকারীর খবর কেউ পায়নি।

তারপর রমেনের হাতে এসেছিল কয়েকহাজার টাকা গোপন পথেই। বাদল রায় রমেনের উপর ভরসা রাখে : আর রমেনও কথা রেখেছে। আজকের বাসেই রমেন নিয়ে এসেছে মেয়েটাকে এখানে। বাদল রায় তখন রমেনকে চেনে না। কারণটা রমেনও জানে। মেমসাহেবকে স্বয়ং বাদল রায় নয়, রমেনও ভয় করে। তাছাড়া অনেক সময় অচেনা থাকাই ভালো তাদের উভয়ের পক্ষে।

বাগানের এদিকটায় লোকজন বিশেষ নেই।

বাদল রায় গলা নামিয়ে বলে—এত দেরী হ'ল ?

রমেন শোনায়—একটু ওকে নিয়ে ঘুরছিলাম স্যার। সঙ্গে নিয়ে না ঘুরলে কি ভাববে মেয়েটা ?

হাসে বাদল রায়—তা ঘোরা! তবে দেখিস যেন ফেঁসে না যাস্।

হাসে রমেন—না, না। ময়রার সন্দেশে লোভ থাকে না স্যার!

বাদল রায়ের মগজে হুইস্কির তাজা নেশাটা ঠাণ্ডা বাতাসে জমে উঠেছে।

রমেন বলে—জিনিসটা স্বচখে দেখলেন তো বাদলদা? বাদল রায় ওর দিকে বোতলটা এগিয়ে দিতে রমেন বলে—আজ থাক, দাদা।

বাদল রায় অবাক হয়ে চাইল। বলে সে।

—কিরে এঁ্যা—অমৃতে অরুচি দেখছি! লক্ষণ তো ভালো লাগছে না।

রমেন মদ খেয়ে কাজলের সামনে যেতে চায় না। নিজের উপর তার বিশ্বাস নেই ভয় হয় যদি বেশি খেয়ে ফেলে! আর খেলে রমেন তখন অন্য মানুষ হয়ে ওঠে।

বলে রমেন—না না। এখন খেলে যদি গুঁটি কেঁচে যায়, তাই।

হাসলে বাদল রায়। দরাজ হাসি থামিয়ে বলে সে চাপা স্বরে।

—তুই শ্লা রামখচ্চর! ঠিক আছে। তাহলে হাতে পাচ্ছি কবে মালটা ?

রমেন বলে—দেখি, কাল-পরশুর মধ্যে পাবেন।

বাদল রায় জানে কি ভাবে কাজ হাসিল করতে হয়। প্যাণ্টের পকেট থেকে একগোছা নোট বের করে রমেনের হাতে দিয়ে বলে।

—ব্যাপারটা একটু ত্বরান্বিত কর, রমেন। তোদের মেমসাহেব যেন জানতে না পারে। বাইরে কোথাও এসব ব্যবস্থা করবি।

রমেন ঘাড় নাড়ে—ওসব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তবে বাদলদা—

বাদল রায় চাইল। শুধোয় সে—আবার কি হ'ল ?

রমেন বলে—মেয়েটার একটা চাকরী-বাকরী করে দিতে হবে। মানে খুব পুওর কিনা।

বাদল রায় এসব কথা বহুবারই শুনেছে। মেয়েরা পুওর বলেই তার ফাঁদে পা দেয়, অবশ্য বাদল রায় তাদেরও ভালো দামই দেয়, আর এক্ষেত্রে চাকরীর কথা শুনে মনে মনে চটে উঠলেও বাদল রায় বলে'।

—দেখছি কি করা যায়। তবে তুই যেন আবার গদগদ হয়ে তাকে চাকরীর কথা বলবি না।

রমেন ঘাড় নাড়ে—না, না। তোমাকেই বল্লাম দাদা। চলি তাহলে, পরে দেখা হবে।

এদিক ওদিক চেয়ে রমেন চলে গেল।

বাদল রায় বোতলের শেষ মদটুকু ঢেলে এবার চুমুক দিচ্ছে। রাত হয়েছে। বাগানে আর কেউ নেই। ওদিকে ডাইনিং হলে কলরব শোনা যায়। বেয়ারাকে ডেকে ঘরে খাবার দিতে বলে, উঠে চলেছে বাদল রায়।

একটু বেশিই খাওয়া হয়ে গেছে।

পা টলছে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাসে দেখা কাজলের যৌবনদৃপ্ত দেহের ছবিটা। শিস দিতে দিতে উঠছে।

এখন লতিকা তার ঘরে নিদ্রামগ্ন। লতিকার ঘুমটাও বেশি। আট-টার মধ্যে ডিনার খেয়ে সে শুয়ে পড়ে, মেদের পাহাড়টা বিছানায় রাত-ভোর পড়ে থাকে—নিঃশ্বাসের সঙ্গে ওঠা-নামা করে বিশাল দেহটা। আবার বিকট শব্দে নাকও ডাকে।

মেয়েদের নাক-ডাকার ব্যাপারটা বিশ্রী।

বাদল রায় এপাশে লতিকা ঘরের দরজাটা লক্-করা দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে পাশেই তার নিজের ঘরে ঢুকলো। একা তবু নিশ্চিন্ত আরামে তার নেশার জগৎ নিয়েই থাকে অবকাশ সময়টুকু বাদল রায়।

সীমা নিমাইকে ঢুকতে দেখে হাসল। নিমাই মাছের আড়ৎগুলো ঘুরে আসছে। তাকে ওখানের দু'চারজন মাছ-মহাজন চেনে জানে। তাই খাতিরও করেছে।

হাওড়ার ফিশ-ডিপোর নামী কোম্পানীর অন্যতম মালিক নিজে এসেছেন, তাঁর আপ্যায়নের কোন ত্রুটি তাই রাখেনি তারা।

নিমাই ফেরার পথে বাজারের কোনো রেস্তোরাঁ থেকে গরম কাটলেট, সন্দেশ আর বিস্কুট এনেছে। সেগুলো টেবিলে নামিয়ে শুধোয় সীমাকে—কতক্ষণ ফিরেছো?

সীমার সাবধানী মন-প্রাণও নিমাইয়ের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চায়। তাই বলে সে—অনেকক্ষণ।

উলটে প্রশ্ন করে সীমা—তোমার এত দেরী হল যে? ভাবছিলাম।

নিমাই সীমাকে তার জন্য ভাবিত হতে দেখে মনে মনে খুশি হয়ে বলে।

—একটু কাজে আটকে গেছলাম, জানতো ব্যবসাদার মানুষ। এখানের মাছ-মহাজনদের সঙ্গে আমাদের কাজ কারবার আছে, ভাবলাম, যখন এসেছি ওদের সঙ্গে দেখা করে যাই। ব্যবসাপত্তরের সুবিধা যদি কিছু হয় দেখে আসি।

সীমা দেখছে নিমাইকে।

ওরা শুধু ব্যবসা, টাকার লেনদেনই বোঝে। সীমার মনে পড়ে বিজনের কথা। সে বলতো, ছোট্ট একটা ঘর আর সামান্য অন্ন জুটলেই খুশি থাকবো, মানুষের টাকা রোজগার করা ছাড়াও অন্য অনেক বড় কাজ আছে।

নিমাই সীমার গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে বলে।

—বুঝলে, ঢেঁকি সগ্‌গে গেলেও ধান ভানে, আমাদের হয়েছে তাই। দারুণ মাছের বাজার জমেছে এবার, কাল সকালে নে যাবো তোমাকে।

হঠাৎ খেয়াল হয় তার। সে বলে।

—কই, কাটলেট ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে? খাও।

সীমা খাবার আগেই সে নিজেরটায় কামড় দিয়ে বেশ তারিয়ে তারিয়ে খেতে থাকে। ওর মুখে চোখে জৈবিক ক্ষুধার আভাস জাগে। সীমা দেখছে বিচিত্র মানুষটাকে।

মণিমালা বৈকালেই সৌকতবাস থেকে তাড়া দিয়ে বের করেছে হরিপদ সরকারকে। দুপুরে খাওয়ার পর হরিপদ সরকারের একটু

দিবানিদ্রার অভ্যাসটা অনেক কালের। দোকানের গদিতে বসে-বসেই ঝিমিয়ে নিতো। এখন ছেলে দুপুরে দোকানে থাকে। সরকারমশাই বাড়িতে ঘণ্টাদুয়েক টানা ঘুম দিয়ে জল-পান খেয়ে আবার গদিতে গিয়ে আসীন হয়।

এখানে দোকানের তাড়া নেই।

গাড়ির ধকলটাও রয়েছে আর দুপুরে আহারটাও ভালোই হয়েছিল। ঘুমুচ্ছে হরিপদ। ঘুমুলে ওর নাকে ব্যাণ্ড ব্যাগপাইপ বাজে একসঙ্গে। মণিমালার আগে সইত না, ক্রমশ সয়ে গেছে এবার।

তবু ঘুম আসেনি মণিমালার।

দোতালার ব্যালকনি থেকে সমুদ্রের নীল বিস্তার, রূপালী বালুচর, বাজারের এদিকের রাস্তা, ঝাউবন, পার্ক সবই দেখা যায়। দুপুরের ঘণ্টাদুয়েক সময়ের জন্য দীঘার জীবন, পথ, পার্ক-এর ভিড়, কলরব কমে আসে। ঝিমিয়ে থাকে দাঘা।

তারপরই আবার সূর্য একটু ঢলে যাবার সময় থেকেই ভ্রমণার্থীরা ঘরের আশ্রয় ছেড়ে বেলাভূমিতে, সমুদ্রের ধারের রাস্তায়, পার্কে ভিড় জমায়। দোকানীরাও দোকান পাতে পথের দুধারে।

—এ্যাই ওঠো! কতো ঘুমোবে? এখানে ঘুমুতে এসেছো নাকি? ডাকছে মণিমালা। উঠে বসে সরকারমশাই।

--কি? কি কইছ?

মণিমালা চঞ্চলা কিশোরীর মত আদুরে গলায় বলে—এ্যাই! লোকজন সব সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছে। চলো, যাবে না?

সরকারমশাই বলে—চা!

মণিমালা শোনায়—চলো তো, বাইরে কোথাও খেয়ে নোব। এখানে চা-ফা দিয়ে যাবেনা কেউ।

হরিপদ সরকার বের হয়েছে। মণিমালা এর মধ্যে নোতুন করে সেজেছে এখানে। নিজের ছেলেপুলেও হয় নি, বয়সও বেশি নয়! তবু কলকাতায় বড় বড় সৎ ছেলে-মেয়ে আছে। তাদের সামনে এমনি

সিল্কের শাড়ি, ব্লাউজ পরেনা মণিমালা ইচ্ছা করেই।

ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আজ মণিমালা নিজেকে দেখছে। পরনে দামী শাড়ি ব্লাউজ-এর আবরণে তার মসৃণ পিঠের রেখা, উন্নত সুগঠিত বুক যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠতে চায়। নিজের রূপটাকে এখানে যেন প্রকাশ করে তৃপ্তি পেতে চায় মণিমালা এই মুক্তির ক্ষণিক মেলায়।

হরিপদ তাড়া দেয়—হইল তোমার?

ঘরে ঢুকেই থমকে দাড়ালো সে মণিমালাকে দেখে। বিস্মিত স্বরে বলে সে—তুমি! মালা?

এ যেন নোতুন এক মোহিনী মালাকেই আবিষ্কার করেছে হরি-পদ। মণিমালা সারা মুখে হাসির ছটা ছড়িয়ে এগিয়ে আসে ওর কাছে। এই নিভৃত নিরালায় যেন একটি চিরন্তন নারী তাকে মেলে ধরেছে, জীবনের সব ব্যর্থতার জ্বালা ওই হাসিতে প্রকট হয়ে ওঠে। মণিমালা শুধোয়।

—কেন? চিনতে পারছো না নাকি গো?

হরিপদ এই আধো আলো-ভরা ঘরে নোতুন মণিমালাকে দেখে বলে —যা সাজছো ইতে চিত্তচাঞ্চল্য আসতি পারে। গুরুদেব কন—

মণিমালা হাল্কাসুরে বলে—তোমার গুরুদেব মাথায় থাকুন, চলো তো, বেলা পড়ে গেলে আর কি দেখবো?

... হরিপদকে মণিমালার সঙ্গে দেখে অনেকেই চেয়ে থাকে। হরিপদের কালো মুষকো চেহারা, গলায় কণ্ঠি, কপালে ক্ষীণ তিলকের দাগও রয়েছে, হাঁটুর উপর কাপড়, গায়ে আকাশী রঙের ফ্ল্যানেলের শার্ট, একটা শাল আর পায়ে কেড্‌স।

লোকটার অঢেল পয়সা তবু সাজ-বেশ অমনিই।

তার পাশে মণিমালাকে বেমানান ঠেকে। হরিপদ দেখছে, মণি-মালা একসঙ্গে বাসে আসা সেই ভদ্রমহিলা আর তার মেয়েকে দেখে কি কথা বলছে তাদের সঙ্গে।

পথের পরিচয়। তবু ভবতারিণীও চিনেছে মণিমালাকে, শুধোয়।

—কোথায় উঠেছো মা?

মণিমালা দেখায় সৈকতাবাস-এর বাড়িটাকে। বলে—ওখানে।

ওদিকে নোতুন বিবাহিত সীমা আর নিমাইকে বীচের দিকে যেতে দেখে চাইল ওরা। ছোট্ট জায়গা, সকলের সঙ্গেই সকলের দেখা হয়। কেউ একটু হাসে—কেউ ত্নটো কথাও কয়।

কাজলও ঝিনুকের মালা কিনছিল, ভবতারিণী আর মিনতিকে দেখে কাজল চাইল, ওদের সঙ্গে রয়েছে সমরও। বাসে দেখেছিল ছেলেটিকে।

কাজল নিজের ব্যাপার দিয়েই বুঝতে চেষ্টা করে মিনতির সঙ্গে সমরের সম্পর্কটা। মেয়েদের চোখে এটা সহজেই ধরা পড়ে।

রমেনের ডাকে সরে এল কাজল।

রমেন বলে—অচেনা অজানা মানুষ। পথেব দেখা, তাদের সঙ্গে এত মাখামাখি কেন? চলো।

কাজল চুপ করে থাকে। তার মনে হয় রমেন চায় না কাজল ওদের সঙ্গে মিশুক। কাজলের নিজেরও লজ্জা করে, পরিচয়হীন একটি তরুণের সঙ্গে সে বাইরে এসেছে এটা যেন গোপনই রাখা দরকার।

—শুনছো!

হরিপদ ডাকছে মণিমালাকে। বলে সে।

—চলো। সন্ধ্যা নামছে, জপ করার লাগব।

হরিপদ মণিমালাকে নিয়ে এসে বসেছে বাঁধের নির্জনে। ঝাউবনে সমুদ্রে সন্ধ্যা নামছে। হরিপদ চোখ বুজে ইষ্টনাম জপ করছে। মণিমালার সেদিকে খেয়াল নেই। সে ওই বীচে ঘোড়ায় চড়া ছেলেদের দিকে চেয়ে থাকে।

ছোট্ট ছেলেমেয়ের দলকে ঘোড়ায় চাপিয়ে লোকগুলো বালিয়াড়িতে নিয়ে চলেছে। আনন্দে ঘোড়সওয়ার ছেলেমেয়েরা কলরব করছে।

মণিমালাও কি বিচিত্র স্বপ্ন দেখে! তার জীবনের ওই শূন্যতা তার

সব প্রাচুর্যকে ম্লান করে দিয়েছে।

হরিপদ গভীর ধ্যানে মগ্ন।

তার মনেও বাইরের জগতের সাড়া—রং, এই উছল কলরব আর মুক্তির ছোঁয়া, মণিমালার ওই ব্যবহার ওর মনে একটা আলোড়ন এনেছে। এতদিন ওরা ছুটি, তৃপ্তির এই জগৎকে দেখেনি। সে শুধু গদি-গুদাম আর পয়সাকেই চিনেছিল। হঠাৎ এই জগৎকে দেখে হরিপদ সরকারের মনে ঝড় উঠছে।

তাই চোখ বুজে দমবন্ধ করে ইষ্টমন্ত্র জপ করছিল।

হঠাৎ কানে আসে ডিস্‌কো দিয়ানা গান-এর সুর আর উদ্দাম কলরব, তীক্ষ্ণ সিটির শব্দ, যেন ঝড় বইছে। ধ্যান ভঙ্গ করে চেয়ে দেখে হরিপদ। তাদের বাসে আসা সেই চ্যাংড়া ছেলের দল-এর সঙ্গে আরও অনেকে মিশে বালুচরে ওই গান বাজিয়ে ঘুরে-ফিরে সারা দেহ কাঁপিয়ে বিকট চীৎকার করে নাচছে।

হরিপদ আরও অবাক হয় মণিমালা জপ-ফপ্ মোটেই করেনি। সহধর্মিণীর মত কোন ধর্মাচরণ না করে সেও তাদের উদ্দাম নাচগান দেখছে, উপভোগ করছে, হাসছে। কি অনাচার!

—এ্যাও। সরকারমশাই হুলো বেড়ালের মত চাপাগর্জন করে ওঠে। মণিমালা চাইল। তার সুন্দর মুখে হাসির মিষ্টি ছোঁয়া। বলে সে।

—দেখছো ছেলেগুলোর কাণ্ড?

সরকারমশাই ঠেলে উঠে পড়ে বলে—দেখছি! বান্দরের দলের বাপের হোটেলে খাই-পরি ত্যাল বাঁন্‌ছে। ওগোর নরকবাস হইব। চলো এহান থনে।

মণিমালা অবাক হয়—নিজেদের খুশিতে নাচছে, আর তো কিছু করেনি?

—করতি কতক্ষণ? শয়তান ওগুলান। চলো। ছিঃ ছিঃ অধঃপাতে যাইব দেশডা। ঘোর কলিকাল।

সরকারমশাই গিন্নীকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে।

মণিমালার নিজেরই লজ্জা করে। চাপা স্বরে বলে।

—আঃ, হাত ছাড়ো! যাচ্ছি! কাণ্ডজ্ঞানও নাই তোমার।

হরিপদ সরকার স্ত্রীরত্নটিকে আগলে নিয়ে চলে এলো।

ভবতারিণী এবার খুশি হয়।

সমর ওদের কটেজে এসে কেয়ারটেকারকে বলে কয়ে মিস্ত্রী আনিয়ে ফিউজ বদলাতে আবার আলো জ্বলে। এতক্ষণে ভরসা পায় ভবতারিণী। বলে সে—দ্যাখ মিনু, বলছিলাম না সমর না এলে এসব হতোনা। মেয়েছেলের কথায় কেউ পাত্তা দেয়? বাঁচলাম বাবা! একটু চা কর—হিটার তো রয়েছে।

সমর বলে—চা লাগবে না।

ভবতারিণী শুধোয়—তা বাবা হোটেলে আছো খেতে-টেতে দেয়তো?

সমর বলে—ওরা কি দেয়? নিজে গিয়ে খেয়ে আসতে হয়। অবশ্য এটা নোতুন কিছু নয়। কোলকাতাতেও মেসেই তো থাকি। ওই পেটেণ্ট ঘ্যাট টলটলে ঝোল খাওয়া অভ্যাস আছে। সুতরাং যেখানেই হোক খাওয়ার কোন প্রবলেমই হয় না আমার।

ভবতারিণী দেখছে সমরকে।

শুধোয়—কলকাতায় মেসে থাকা হয় বুঝি?

জানায় সমর—হ্যা। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের একটা মেসে থাকি, চাকরী করি ব্যাঙ্কে।

—বাড়িতে মা বাবা কেউ নেই? ভবতারিণী প্রশ্ন করে।

বাবা-মা-এর কথা মনে পড়ে। বহরমপুরের গঙ্গার ধারে তাদের বাড়িটার কথা আজও ভোলেনি সমর। বাবা মারা যাবার পরের বছরেই মা-ও মারা যান। তখন ছোট্ট সমর।

সমর বলে—মা-বাবা মারা যাবার পর কাকা-কাকীমার কাছে মানুষ হয়েছিলাম বহরমপুরে। সেখানের কলেজে পাশ করে এলাম কলকাতায়, চাকরিটা জুটে গেল। রয়ে গেলাম কলকাতায়। একাই

বলতে পারেন তখন থেকে।

ভবতারিণী ভাবছে।

বহরমপুরের মেয়ে সে। কবে অতীতে তার দিন কেটেছিল সেখানে, তারপর আর যায়নি বহু বছর। তাই বহরমপুরের নাম শুনে বলে ভবতারিণী।

—বহরমপুরের কোথায় তোমাদের বাড়ি?

সমর বলে—কাদাই-এ।

ভবতারিণী শোনায়—আমার বাপের বাড়ি গোরাবাজারে।

মিনতি দেখছিল ওদের। বারান্দার ওপাশেই রান্নাঘর।

রান্নার সব সরঞ্জামই আছে। এবেলার মত রুটি তরকারী, মায়ের জন্য দুধ মিষ্টি এনেছে মিনতি, রান্নার হাঙ্গামা করেনি।

চা-ই করছিল, মা তন্ময় হয়ে সমরের সঙ্গে কথা বলে চলেছে। মিনতি চায়ের কাপটা এনে বলে—আপনার চা।

ভবতারিণী বলে—বুঝলি মিনু, সমরের বাবা-কাকারা আমাদের চেনা। কাদাই-এর ঘোষালরা।

মিনতি চুপ করে থাকে। তার মুখে উৎসাহের ছায়া পড়ে না।

সমর বলে—আবার কষ্ট করে চা করতে গেলেন কেন?

মিনতি বলে—কষ্ট আর কি? মায়ের জন্য করছিলাম, এতক্ষণ ধরে বকলেন, একটু গলা ভিজিয়ে নিন্।

ভবতারিণী বলে—কি কথার ছিরি তোর মিনু! কিছু মনে করোনা বাবা ওর কথায়। নাও, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

সমর চায়ে চুমুক দিতে থাকে।

ভবতারিণী বলে—তাহলে তুমি তো চেনা-জানার মধ্যেই বাবা। এখানে এসে দেখা হয়ে গেল। তা বাবা—হোটেলে খেতে দেয় কেমন এখানে? বেশ বড়-সড় বাড়িতো দেখলাম।

সমর বলে—রান্নাবান্না সেই এক রকমই। ওসব খাওয়া অভ্যাস আছে। আজ চলি। রাত্রি হয়ে গেছে।

ভবতারিণী বলে—কাল এসো বাবা। আমাদের একটু খোঁজ-

খবর নিও। ওরে মিনু, সময় যাচ্ছে, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আয় বাছা।

বাইরে বেশ খানিকটা খোলামেলা জায়গা, সামনে সমুদ্রের বাঁধ, সেখানে ঝাউবন গড়ে উঠছে, বেশ খানিকটা জায়গায় এখানে গড়ে উঠেছে ছোট্ট বাড়িগুলো, পথের তুপাশে ঝাউগাছ—রকমারি ফুলের গাছও রয়েছে। দূরে দূরে তু'একটা মিটমিটে আলো জ্বলছে। ছায়া অন্ধকারে জায়গাটা মোহময় রূপ নিয়েছে। ঠাণ্ডায় লোকজন বের হয়নি, বন্ধবাড়িগুলোর দরজা-জানলার ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা এসে পড়েছে।

সমর বের হয়ে আসছে. মিনতিকে দেখে চাইল।

সমর বলে—চলি।

মিনতি শোনায়—মায়ের সঙ্গে গল্প করতে কাল আসবেন কিন্তু।

সমর কথাটার মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা অভিযোগের সুরই শুনেছে।

বলে সে—তাহলে আপনার সঙ্গে কথা বলা বারণ?

মিনতি হাসল। সেই হাসিটুকু ওর তু'চোখের তারায় ছড়িয়ে পড়ে।

মিনতি বলে—সে আপনার ইচ্ছে।

সমর শোনায়—অপরপক্ষের ইচ্ছাটা তো দেখিনি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। চলি।

সমর চলে এল জবাবটা না শুনেই।

পিছন ফিরে দেখে মিনতি তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

ভবতারিণী মেয়ের কথাও ভেবেছে। কিন্তু ভেবে কূলকিনারা পায়নি। ভবতারিণীও চেয়েছিল অন্য মায়েদের মতই তার মেয়েরও ঘর-বর হোক, কিন্তু নিজের জীবনের সমস্যাটাও জড়িয়ে আছে।

মিনতি বলে।—ওসব কথা রাখোতো মা, বিয়ে ঘর করতে যাবো

তোমাকে ফেলে কোন্ চুলোয় ?

ভবতারিণী তবু বলে—তাই বলে এই ভাবেই চলবে তোর জীবন ?

হাসে মিনতি—চলুক না।

ভবতারিণী বিরক্ত হয়ে বলে—তারপর মা মলে তখন তো আধবুড়ি হয়ে যাবি। আর বিয়ে-থা হবে তোর ?

মিনতি সরে যেতো। ওসব প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতো ওই ভাবেই।

আজ ভবতারিণী কি ভাবছে।

সমরের কথা—বহরমপুরের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। সমরের বাবাকে চিনতো সে, ওদের কাদাই-এর বাড়িতে গেছে আগে। তখন বহরমপুরের দিনগুলো ছিল অনেক সুখের, শান্তির। সমর হঠাৎ এতদিন পর তার সেই ফেলে আসা স্মৃতিগুলোকে মনে করিয়ে দিয়েছে। বাতাসে ভেসে আসে সমুদ্রের গর্জন।

মিনতি মায়ের কথায় চাইল।

ভবতারিণী বলে—সমর ছেলেটি সত্যি ভালো রে। বাবা-মাকে অবেলায় হারিয়েছে বেচারা।

মিনতি মায়ের দুধ মিষ্টি এনে বলে—বাবা-মা কারোও চিরকাল থাকে না। সারাদিন ধকল গেছে, খেয়েদেয়ে শোবে চলো।

ভবতারিণী মেয়েকে শুধায়—তোর খাবার কই ?

মিনতি বলে—আজ আর রান্নাবাড়ার ব্যাপার করিনি। দোকান থেকে পুরি তরকারী এনেছি ওই দিয়েই চালিয়ে নেব। কাল সকালে বাজার-হাট করবো। ভবতারিণী বলে—তাই করবি। ওই-সব খাবার খেয়ে থাকা যায় না।

রমেন আর কাজল খেতে বসেছে তাদের হোটেলের খাবার ঘরে। অবশ্য নীচেই খাবার জায়গা। এখানে হোটেলের বাসিন্দারা ছাড়াও বাইরের কিছু ভ্রমণার্থীরাও খেতে আসে।

সানমাইকার টেবিল চেয়ার, হাতমুখ ধোবার বেসিন রয়েছে। আর ওদিকে পার্টিশান-করা কেবিনও রয়েছে। এখন বাইরের লোক-

জনের ভিড় কমেছে, হল্‌টা ফাঁকাই।

কাজল ও রমেন একটা কেবিনে খেতে বসেছে। গরম গরম ভাত, সুঘ্রাণওয়ালা মুগের ডাল, ফুলকপির তরকারী, মাংস। কাজল বাইরে এসে যেন ঘরের সেই দৈন্য ভুলে অন্য জীবনকে দেখেছে। রমেনকে আজ নোতুন করে চেনে সে।

কাজল সহজ শাসনের সুরে বলে—এ্যাই, আবার মাংস-টাংস কেন? এত খরচ—

হাসে রমেন। তার পকেটে তখনও বাদল রায়ের দেওয়া টাকা-গুলো মজুত রয়েছে। রমেন জানে কি ভাবে কৌশলে ওদের কাছ থেকে টাকা বের করতে হয় আর চারের মাছকেও চারে রাখতে হয়। মাঝে মাঝে বিরক্তি বোধ করে। লোভও হয়। মনে হয় এসব বাজে কাজ আর করবে না, বেশ কিছু টাকা পেলে সে এবার অন্য কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধবে।

দেখছে সে কাজলকে। আবছা আলোয় ওকে সুন্দর দেখায়। চোখের চাহনিতে কি নিষ্পাপ মায়া, হয়তো এর নামই ভালোবাসা। ধুস্‌ শ্লা! রমেন যেন হড়কে যাবে। পরক্ষণই মন থেকে সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে রমেন বলে—মাংস খাব না কেন? খাও তো, দারুণ রেঁধেছে।

রমেন মুরগীর ঠ্যাংটা ধরে চিবুতে থাকে একটা মাংসাশী জানোয়ারের মত। এবার রমেনের মাথায় বুদ্ধিটা খেলেছে।

বলে সে—বুঝলে কাজল, আজ হঠাৎ এখানে এক কারখানার মালিক বিরাট লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বেড়াতে এসেছে। কথায় কথায় বল্লাম—তোমার কথা। একটা চাকরী করে দিতে হবে দাদা। গাঁইগুঁই করতে লাগলো আমিও নাছোড়বান্দা। শেষমেষ বলে—ঠিক আছে। কলকাতায় গিয়ে দেখবো। আমি বলি—ওসব ধানাই-পানাই পাটোয়ারী বাত ছাড়ো গুরু, দেখতে হয়—এখানে সে এসেছে, দেখে-শুনে মানে ইনটারভিউ নিয়ে নাও, ফিরে গিয়ে চাকরী দিতে হবে তাকে।

কাজল যেন স্বপ্ন দেখছে। চাকরী পাবে সে। স্কুল ফাইনাল পাশ করে টাইপ শিখছে বেশ কিছুদিন ধরে। এখান ওখানে ঘুরছে কিন্তু কোন সুরাহাই হয়নি। আজ যদি কিছু হিল্যে হয় এখানে। কাজল আশাভরে শুধোয়—কি বল্লেন তিনি ?

রমেন দেখছে কাজলের আগ্রহটা। আর সেটা দেখে খুশিই হয়েছে রমেন। বলে সে—একবার দেখাটা করিয়ে দিই, তুমিও বলো তাঁকে। তারপর দেখা যাক তোমার কপাল আর আমার হাত-যশ।

কই হে—চাট্টি ভাত দিও আর মাংসের ঝোলও।

রমেন গোগ্রাসে গিলছে। কি স্বপ্ন দেখে কাজল! চাকরি হয়েছে, সুখী হবে সে। বাবা-মাকে সাহায্য করতে পারবে। হাল ফিরবে সংসারের।

সীমার ঘুম আসেনি।

নিমাই তখন ঘুমে অচেতন। সারাদিন ঘোরাঘুরির পর নিমাই ঘুমিয়ে পড়েছে। টুরিস্ট লজের তেতলার ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালো সীমা। সামনে জনহীন পথ, সারাদিনের ক্লান্তি, ভিড় আর উত্তেজনার পর দীঘার ছোট্ট জনপদ এখন ঘুমিয়ে আছে।

রাস্তায়, সমুদ্রের ধারে আলোগুলো জ্বলছে। নিঃসঙ্গ অবস্থায় জেগে আছে শুধু দীঘার সমুদ্র। একদিক থেকে অন্যদিক অবধি দীর্ঘ ঢেউ-গুলো বাধা প্রাচীরের মত ছুটে এসে আছড়ে পড়ে। বিদীর্ণ ঢেউ-এর মাথায় ফসফরাসের আভা শুভ্র যুঁই ফুলের মত ছিটিয়ে পড়ে। আবার ঢেউ ওঠে···আবার ফেটে যায় শতধা হয়ে। কি ব্যর্থ আক্রোশে ফুঁসছে অশান্ত সমুদ্র!

সীমার মনে পড়ে তার হারানো দিনের কথা।

বিজনকে হঠাৎ এতদিন পর এখানে দেখবে তা ভাবেনি। সেই থেকে মনের মধ্যে ঝড়টা গুমরে ওঠে, বার বার কি কঠিন প্রতিবাদে ফেটে পড়তে চায় সে, কিন্তু পারেনি সীমা।

নিমাইকে, ওর ব্যবসাদারীর জীবন, ওই মনোবৃত্তিকে মেনে নিতে

পারেনি। দীঘায় এসেও সে বাণিজ্য নিয়েই মেতে আছে। সীমা তাই নিঃসঙ্গ, তার মনের জগতে নিমাই যেন আজও অপরিচিত কোন জন। মনের পরশ ছাড়া শুধু দেহটাকে নিয়েই নিমাই-এর মত মানুষ খুশি, কিন্তু সেই মুহূর্তগুলো দুঃসহ মনে হয় সীমার কাছে।

বিজন-এর আজকের খবর সে জানেনা, শুধু পাশেরই কোন গ্রামের কথাই বলে গেছে। সেখানেই রয়েছে বিজন। সীমার মনে জাগে নীরব ব্যাকুলতা। অনেকদিন পর সীমা যেন আগেকার সেই হারানো দুঃসাহসী কুমারী মনকে ফিরে পেয়েছে।

দীঘায় মাছের বড় বাজার বসে কয়েক মাসের জন্য। অক্টোবর থেকে মার্চ অবধি চলে সেই মরশুম।

সমুদ্র শান্ত থাকে, তখন মেদিনীপুর, রূপনারায়ণ—রাণাঘাট—পদ্মার ধারে লালগোলা প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দল বেঁধে আসে জেলে—মাছমারার দল। মহাজনরাও এসে হাজির হয় এখানে।

দীঘার শহরের বাইরে সমুদ্রের ধারে বিস্তীর্ণ বালুচর, ঝাউবনের ছায়ায় বসে অস্থায়ী মাছমারাদের বসত। সমুদ্রের ধারের গ্রামবসতের মাছমারার দলও এদের সঙ্গে সামিল হয়। মহাজনদের লঞ্চ বেশ কয়েকটা নৌকায়, জাল—খাবার-দাবার—জল নিয়ে সমুদ্রে মাছ মারতে যায়। এমনি বিভিন্ন দলে হাজার দুয়েক নৌকা সমুদ্রে যায়। দু'একদিন ধরে দূর সমুদ্রে মাছ ধরে ফেরে তারা ভোর নাগাদ এই বালুচরের আড়তে।

রাশি রাশি রূপালী ইলিশ, প্যাম্পফ্রেট—ভেটকি—বাগদা চিংড়ি—পার্শে—রূপাপেটিয়া—বাঁশপাতা—সিলেট—নানা জাতের মাছ আসে। সেই মাছ পাইকেরী দরে নীলাম হয়ে ট্রাকে বরফবন্দী হয়ে কলকাতা, খড়গপুর হয়ে আসানসোল, দুর্গাপুর, জামসেদপুরের দিকে যায়।

মাঝে মাঝে হাঙ্গরের পালও ধরা পড়ে জালে। তবে বড় হাঙ্গর জালে পড়লে মুস্কিল। দামী জাল ছিঁড়ে যায়, ফর্দাফাঁই হয়ে যায়। তাই ওদের ধরে না পারতপক্ষে। ছোট মাঝারি হাঙ্গরের ঝাঁক পড়লে

ছাড়েনা।

নিমাই ভোরে উঠেছে। মাছের বাজারের ছ'চার জন মহাজন বলেছে ওকে আজকের মাছের বাজার দেখতে। নিমাইও তাই আজ ভোরেই গিয়ে মাছের বাজারে কিছু বাণিজ্য করবে, যদি দমকা কিছু এসে যায়।

সীমা তখনও ঘুমুচ্ছে। ভোরের আকাশ সবে ফিকে-ফিকে হয়ে আসছে, সূর্য উঠতে দেরী আছে তখনও। ঝাউবনে ছ'চারটে পাখির সত্ত ঘুম ভাঙছে। নিমাই ভাবে ঘণ্টা ছয়েকের মধ্যেই ফিরবে সে। তাই দরজাটা ভেজিয়ে নীচে এসে চৌকিদারকে ব'লে বের হয়ে পড়ে নিমাই।

শেষ রাতের ছ'একটা তারা জ্বলছে—তাদের উজ্জ্বল নীলাভ আলো পড়েছে দূর সমুদ্রের নিথর জলে, বীচে লোকজন তখনও আসেনি, ছ-একদল জেলে সমুদ্রে টানাজাল ফেলে মূল দড়িতে বাঁশ বেঁধে টানছে ছপাশে। ওই জাল তখনও দূর সমুদ্রে রয়েছে। জাল উঠতে ঘণ্টা-তিনেক দেরী হবে।

ওদিকের মাছের বাজার তখন জমে উঠেছে। নৌকা থেকে ঝুড়ি-ঝুড়ি মাছ নামছে, পমফ্রেট, ইলিশ, পারশে, বাগদা চিংড়ি—আরও কত মাছ। এদিকে বালিয়াড়িতে গাদা করা আছে ছোট, মাঝারি সাইজের একদল হাঙ্গর। পেটটা মেটে রং-এর, পেটের তলাটা সাদাটে। মাংসল তির্যক দেহ। দাঁতগুলো ঝকঝক করছে। এখন এরা মৃত, স্তব্ধ।

কিশোর-এর বাড়ি সমুদ্রের ধারে অলঙ্কারপুরে। ছেলেবেলা থেকেই সমুদ্রে যায় মাছের নৌকায়। খোরাকি আর পাঁচ টাকা রোজ, আর পায় ধুতি-গেঞ্জি, গামছা তাও অবরে-সবরে। তবু বাচ্চা ছেলেটা খুশি।

মরা হাঙ্গরগুলোকে বালিতে টেনে টেনে এনে ফেলছে। সে বলে।

—শালোদের জলে বিত্তেপ দ্যাখেননি বাবু, রাক্কোস! মানুষ পেলে চেটেপুটে খেয়ে ফেলবে।

মহাজন নীলামে তুলেছে হাঙ্গরের দলটাকে সাইজ করে।

নিমাইদের এসব কারবার নেই।

ওরা ভালো মাছের কারবারী। এদিকে ভেটকি-ইলিশ নামানো হয়েছে। দর হাকছে দু'চার জন স্থানীয় মাছ-ব্যবসায়ী। নিমাই-এর চেনা আড়তদার বলে—মাছের আজ টান আছে বাবু!

নিমাইও কারবারী লোক। দেখেছে কলকাতার সঙ্গে দরের মার্জিনটা, ট্রাক-ভাড়া দিয়েও কলকাতার বাজারে অনেক লাভ থাকবে।

কুইণ্টালের দর তখন তিনশোতে দাঁড়িয়ে আছে। নিমাই হাঁকে চারশো টাকা।

এক দমকায় একশো টাকা দর উঠতে দেখে অন্যরা অবাক হয়। তারা বিশ-পঁচিশ করে দর তুলছে। এ হেঁকেছে শ' টাকার হিসেবে। অন্যরা পিছিয়ে যায়। একজন হাঁকে চারশো পঁচিশ।

—চারশো পঞ্চাশ। নিমাই ঘোষণা করে।

তত মাছের খদ্দের তখনও আসেনি। এই ফাঁকে নিমাই চারশো পঞ্চাশ টাকা কুইণ্টাল দবে প্রায় চল্লিশ কুইণ্টাল মাছ গস্ত করে ফেলেছে। কলকাতায় এ মাছ পাইকারী বাজারে নিদেন হাজার টাকা দরে বিকোবে—বরং চিস্ক., লালগোলার মাছ কম এলে বারশো টাকা দর পাবেই।

নিমাই আড়তদারকে নিয়ে এবার ট্রাকে মাল তোলাচ্ছে, বরফের চাঁই ভাঙ্গা হচ্ছে। এতক্ষণ নিমাই নানা কাজে ব্যস্ত ছিল। এবার কাজগুলো মিটেছে। একদিনে দীঘা বেড়াতে এসেও নিমাই ঘোষ দমকায় বেশ কয়েক হাজার টাকা রোজকার করেছে।

—চা নিন বাবু! আড়তদারের ওখানে কাজ করে কিশোর।

ছেলেটি এমনিতে হাসিখুশি চটপটে। কাল রাতভোর মাছ ধরে ফিরেছে তবু ক্লান্তি নাই। চা এনে দেয়।

খেয়াল হয় নিমাই-এর।

—কত বেলা হয়ে গেল!

তখন সূর্য উঠে পড়েছে। দীঘার সমুদ্রতীরে তখন জমেছে ভ্রমণার্থীদের ভিড়।

নিমাই আড়তের তক্তপোষে বসে চা খাচ্ছে।

আড়তদার বলে—তা এত কাজ করলেন, দেরী হবেনা বাবু?

নিমাই এতক্ষণ সব ভুলে ছিল ব্যবসার নেশায়, এবার মনে পড়ে তার সীমার কথা। কিন্তু ব্যবসা বড় কঠিন জিনিস। মাছের ট্রাককে কলকাতার পথে যাত্রা করিয়ে নিমাইকে যেতে হবে পোস্টাপিসে। সেখান থেকে কলকাতায় তাদের আড়তে ট্রাঙ্ককল করে খবরটা, দরদাম জানাতে হবে। আজই আবার টাকা নিয়ে ওই ট্রাকেই লোক আসবে। নিমাই কালও মাছ পাঠাবে কলকাতার বাজারে।

এখন টাকা—ব্যবসার কথাই ভাবছে সে। সীমা ট্যুরিস্ট লজে রয়েছে—আধুনিকা, লেখাপড়া জানা মেয়ে। সে ঠিক উঠে বেয়ারাকে দিয়ে চা ব্রেকফাস্ট আনিয়ে খেয়ে নেবে।

নিমাই নিজের কাজটাকেই এখন বড় করে দেখে।

সকালের আলো এখনও সোনালী হয়ে রয়েছে। রাতভোর মানুষগুলো ঘরের কোটরে বন্দী হয়ে থেকে এবার দিনের আলোয় বের হয়ে পড়েছে সমুদ্রের ধারে, বাজারের পথে, ঝাউবনে, বাস-বন্দী নোতুন মানুষজনও আসছে।

সকালে উঠেছে সমর।

ব্যালকনিতে এসে পড়েছে রোদের আভা, সমুদ্রের বেলাভূমিতে ভিড় জমেছে। আজ ছুটি। মেসের সেই বদ্ধ চৌবাচ্চার জলে তাড়াহুড়ো করে স্নান সেরে খাবার ঘরে ফার্স্ট ব্যাচের মিউজিক্যাল চেয়ার দখলের মত খেলা করে আসন হাতিয়ে বসে ফুটন্ত ঝোল ভাত খেয়ে দৌড়তে হবেনা। অপিসের গুতোগুঁতি নেই। সমর চায়ের কাপটায় আরাম করে চুমুক দিচ্ছে সিগ্রেট ধরিয়ে। রোদের তাপটা পিঠে দেহে একটা কবোষ্ণ উত্তাপ আনে।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চাইল সমর। অবাক হয়েছে সে।

—তুমি! ইয়ে আপনি?

হাসছে মিনতি। সকালের সোনালী রোদের আভা পড়েছে ওর

নরম মুখে। ফর্সা মুখের উপর দু'একগাছি চূর্ণ কুন্তল এসে পড়েছে। চোখের তারায় বিচিত্র হাসির ঔজ্জ্বল্য জাগে।

মিনতিও শুনেছে সমরের এই ডাক। ভালো লাগে তার। ওই ডাকে যেন মানুষকে কাছে আনা যায় সহজে। মিনতি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বলে—বেশতো হলিডে মুডে রয়েছেন দেখছি।

সমর বলে—তা সত্যি। ছুটি যে এত আরামের তা জানা ছিল না। চা দিই? পটে রয়েছে।

মিনতি বলে—চা খেয়ে বের হয়েছি। চলুন, সি-বীচে নাকি মাছের বিরাট বাজার বসে। ওখানে মাছ কিনে বাজারপত্র সেরে ফিরতে হবে।

সমর বলে—এখুনিই বেরুতে হবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই, বেলা হলে মাছ পাওয়া যাবে না।

মিনতি শোনায়। সমব উঠলো।

বিস্তীর্ণ বালিয়াড়িতে কালো কালো স্তূপের মত পড়ে আছে বিরাট এলাকা জুড়ে কি-সব। কাছে গিয়ে মিনতি আঁতকে ওঠে।

—ওমা এত কচ্ছপ! বিরাট বিরাট কাছিমকে চিৎ করে রেখেছে বালিতে। এত কাছিম সমুদ্রে থাকে?

কাছেই কাছিমের মহাজনও ছিল। সেই জানায়।

—আজ্ঞে অনেক আছে। আর কাছিমের ডিপো সাতভায়ের দ্বীপে। এখান থেকে আট ঘণ্টার পথ লঞ্চে। দ্বীপের বিরাট বালিচরে হাজার কাছিম রোদ পোয়ায়, নৌকা নে গিয়ে চরে নেমে এরা যত-গুলোকে পারে বালিতে চিৎ করে দেয়, সেইগুলো ধরা পড়ে। বাকী-গুলো ততক্ষণে সমুদ্রের জলে নেমে যায়। এদের পাগুলোয় তার বেঁধে আটকে বন্দী জালে কাছিমের দঙ্গল সমুদ্রে টেনে এনে এখানে হাজির করে।

সমর বলে—দীঘার বাস-স্টপেজে দেখলাম ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট লিখেছে বড় বড় সাইনবোর্ডে কাছিম-মারা নিষেধ, আর এদিকে এইভাবে কাছিম ধরছেন আপনারা?

ভদ্রলোক বলে—ওসব লেখাই থাকে মশাই, মানুষকে তো খেয়ে বাঁচতে হবে। সস্তায় এত ভালো মাংস আর কি পাবে বলুন? এক-একটা কাছিমের দাম এখানে তিরিশ-চল্লিশ টাকা, মাংস হবে সব বাদ দিয়ে নিদেন পনেরো-কুড়ি কেজি, তাও সব বিক্রী হয় না মশাই। খদ্দের তেমন না এলে, বেশি মাল উঠলে ক'দিন বালিচরে পড়ে থেকে মরে যায় এগুলো। দেখুন না কতো মরেছে।

অদূরে বালিচরে পড়ে আছে রাশীকৃত মরা কাছিমগুলো, কুকুরের দল খাচ্ছে তাদের পচা মাংস, কাক উড়ছে। বাতাসে ওঠে পচা বিশ্রী গন্ধ। যেন নরকের রাজ্য!

সমর বলে—চলো, সরে পড়া যাক এই নোংরা থেকে।

এদিকটায় লোকজন ভিড় করেছে। বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি ঝাউবনে গড়ে উঠেছে চায়ের দোকান, নৌকায় রান্না করার জন্য কাঠের দোকান, সস্তার হোটেল, চা রুটি—ভাতও মেলে এখানে। মায় চুল কাঁটার দোকানও বসেছে।

আর চারিদিকে ছোট বড় মাছের আড়ৎ। মাঝিদের অস্থায়ী আস্তানা। লঞ্চ-মেরামতির লোকজনও রয়েছে।

বালিতে রাখা রকমারি মাছ, বেশির ভাগ পাইকেরী দরে বিক্রীর পর খুচরাও বেচে তারা।

মিনতি থমকে দাঁড়ালো।

একরাশ ছোট-মাঝারি হাঙ্গরের পাখনাগুলো কাটছে একজন। কিশোরী সেই বাচ্চা ছেলেটা সেই কাটা পাখনাগুলোয় বীটলবণ মাখাচ্ছে।

—এসব কি হবে? মিনতি শুধোয়।

বাচ্চা কিশোরী এতবড় মেয়ের এই অজ্ঞতায় হেসে ফেলে বলে।

—ইসব জানেন না? হাঙ্গরের পাখনার দাম অনেক গো। ইখানেই বিকুচ্ছে আশি টাকা কেজি। বীটলবণ মাখিয়ে ইসব হিল্লী-দিল্লী বোম্বাই-এ চালান যাবে, ইয়ার ঝোল হয় সরেস। আর বাকী হাঙ্গর যাবে কলকাতায়। চপ-টপ হয় দোকানে।

মিনতি জানতো না এসব। সমর বলে।

—হোটেল-রেস্তোরাঁয় ফিশ-ফ্রাই কাটলেটও হয় এই দিয়ে।

—তাই নাকি! মিনতি দেখছে ব্যাপারটা।

কিশোরী বলে—সমুদ্রে ঝাঁক বেঁধে ঘোরে কিনা তাই একসাথে জালে পড়েছে অ্যাতো।

মিনতি শুধোয়—তুই সমুদ্রে গেছিস কখনও?

এহেন প্রশ্নে কিশোরী অবাক হয়ে বলে।

—কি যে বলেন দিদি! কতবার গেছি—নীল দরিয়া। কূলতল নাই—ইয়া ঢেউ-এ নৌকাগুলোন নাচে। নৌকা থেকে জাল ফেলে-ফেলে যাই। লাল নীল বড় বড় বয়ায় ভাসে জালের নিশানা। তারপর টানো সেই জাল।

সমুদ্র যেদিন দয়া করলেন এক টানে চার-পাঁচ কুইণ্টালই মাছ উঠে যাবে। আমিও জাল টানি সমুদ্রে।

মিনতি দেখছে ছোট্ট ছেলেটাকে!

অকূল সমুদ্রে ছোট্ট নৌকায় ছেলেটা সমুদ্র চষে বেড়াচ্ছে। চোখে তার সমুদ্রের স্বপ্ন।

সমর বলে—চলো, মাছ কিনবে না?

কিশোরী শুধায়—মাছ নেবেন?

মিনতি চাইল। কিশোরী বলে—ইখানে গলা-কাটা দর মহাজনদের। চলেন মোহনার মুখে, চেনা-জানা লোক আছে, ভালো মাছ পাবেন।

দক্ষিণ মেদিনীপুরের বুক চিরে এসেছে বড় ক্যানেলটা, দূরে লকগেটে জল বের করার ব্যবস্থা আছে, সেই ক্যানেলের জল এসে পড়েছে সমুদ্রে। যেন একটা নদী এসে পড়েছে।

তার ধারেও ছোট মাছের বাজার বসে। কিশোরীই দর-দাম করে মিনতি আর সমরদের মাছ কিনে দেয়। মিনতি বাগদা চিংড়ি দেখে অবাক হয়—সুন্দর চিংড়ি! তাজা পার্শে—

বেশ কিছুটা মাছই কিনে ফেলে মিনতি।

সমর বলে—একা মানুষ, কতো মাছ নেবে?

মিনতি বলে—শীতের দিন, নষ্ট হবে না। মাছ তো হল, এবার বাজারে যেতে হবে।

সমর বলে—বেড়াতে এসেছো না সংসার করতে এসেছো বলো দিকি ?

ক্রমশ সহজ হয়ে উঠেছে তারা দুজনে নিজেদের অজান্তেই।

বালুচর ধরে ফিরছে ওরা। পায়ে এসে লাগে সমুদ্রের ঢেউ-এর ছিটানো জলরাশি। মিনতি শাড়িটাকে হাঁটু অবধি তুলেছে। সুন্দর ফর্সা পায়ের ডিমগুলো নীল জলে দেখা যায়। সমুদ্রের ঝোড়ো হওয়ায় উড়ছে ওর শাড়ির আঁচল, এলোমেলো চুল। শাড়িটা মাঝে মাঝে খসে পড়ে। সুগঠিত যৌবনবতী দেহের রেখাগুলো সোচ্চার হয়ে ওঠে। ফর্সা ঘাড়—অনাবৃত গলার কিছুটা কমনীয় আভাস সমরের চোখে কি আবেশ আনে! ছুটির এই স্বাদ, এই অনাস্বাদিতপূর্ব মাধুর্য কি গভীর সুর তোলে সমরের মনে! দুজনের ব্যবধান যেন ঘুচে গেছে।

মিনতিও তাই নিজের খুশিতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তার এতদিনের বঞ্চিত জীবনে এমনি কোন সঙ্গীও আসেনি, আসেনি এমনি মনোরম কোনও মূহূর্ত।

মিনতি বলে—সংসার তো করা হয়নি মশাই-এর, চিরকাল মেষশাবক হয়েই থাকা হল। সংসারের ব্যাপার বুঝবেন কি করে ?

সমর বলে—তা সত্যি।

মিনতি শোনায়—ওটা আমি করি।

—একা একা।

মিনতি হাল্কা হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে বলে—দোকলা আর হতে বাসনা নেই।

সমর শোনায়—তাই নাকি!

দীঘার বাজার বলতে ওইটুকুই। এককালে খড়ের কয়েকটা চালার নীচে সামান্য তরিতরকারী নিয়ে বসতো দু'একজন। এখন তারা পাকা বাড়িঘেরা ঠাঁই-এ বসে। বাঁধা দোকানপত্রও আছে। ওষুধের দোকান, মনোহারী দোকানপত্রও গজিয়েছে।

সমর বলে—বোঝাটা তো বেড়েই চলেছে।

আলু, কফি-টম্যাটো, কিছু মসলাপত্র, তেল-সব কিনেছে। সমর বলে,—চলো পৌঁছে দিয়ে আসি।

মিনতিও মনে মনে খুশি হয়। মুখে বলে—যাবেন কষ্ট করে?

সমর বলে—এত বোঝা সমেত মেয়েকে পথে ছেড়ে দিলে মাসীমা কি ভাববেন?

ভবতারিণীও খুশি হয় সমরকে দেখে।

মালপত্র, মাছ দেখে বলে ভবতারিণী—ও মিনু, রাজ্যের বাজার করে আনলি, এত মাছপত্তর। তা বাবা সমর, ওই হোটেলে না খেয়ে দুপুরে এখানেই খাবে।

সমরের ছুটির দিনে অভ্যাসটা খারাপই, খেয়েদেয়ে একটু ঘুমনোর অভ্যাস। সমর বলে—ছুটির দিন দুপুরের খাওয়ার পর আর নড়তে পারি না।

হাসে মিনতি—বসতে পেলে শুতে চায়। ভালো লোককে নেমন্তন্ন করছো মা!

হাসে ভবতারিণী—গড়াবার জায়গা হয়ে যাবে বাবা। দুখানা ঘর তো রয়েছে।

সমর বলে—তাহলে আপত্তি নেই। ঠিক আছে। এখন তাহলে চলি, স্নানটান করে আসবো।

ভবতারিণী বলে—তাই এসো বাবা। ওরে মিনু, বাগদা চিংড়ির মালাইকারী কর নারকেল দিয়ে, আর পার্শেমাছের ঝাল। ধনেপাতা এনেছিস তো?

মিনতি বলে—তোমার অতিথির জন্য ধনেপাতা-কাঁচালঙ্কা বেশি করেই এনেছি মা।

ভবতারিণী ওদিকের কল-ঘরে তরকারী ধুতে ব্যস্ত। সমর চাইল মিনতির দিকে। মিনতি এর মধ্যে গাছকোমর করে শাড়িটা জড়িয়ে উনুন ধরিয়ে রান্না চাপাতে ব্যস্ত।

—চলি। সমরের ডাকে চাইল মিনতি। বলে সে।

—আসছো কিন্তু।

এ যেন আদেশই। ক'দিনেই মিনতি তার অনেক কাছে এসে গেছে, এই আদেশ করার অধিকার ও যেন পেয়ে গেছে। সমরও খুশি হয়ে বলে।

—নিশ্চয়ই।

মিনতি মাকে কল-ঘর থেকে বেরুতে দেখে হঠাৎ যেন বদলে যায়। কঠিনস্বরে বলে—পাড়াশুদ্ধ লোককে নেমন্তন্ন করবে আর রাঁধতে হবে আমাকে? বেড়াতে এসে এসব ধকল পুইতে পারবো না তা বলে দিচ্ছি মা।

সমর বাইরে থেকে মিনতির এই শাসানি শুনে মনে মনে হাসছে। মনে হয় মিনতি জানাতে চায় মাকে—সে মায়ের এই ব্যাপারে খুশি হয়নি আদৌ। ভবতারিণী সেটা বুঝতে পারে না। চাপা স্বরে মেয়েকে ধমকায়।

—থাম তো মিনু। বাছাকে খেতে বললাম তাতে তোর যদি এত অমত তুই সরে আয়। আমি রাঁধছি।

মিনতি শোনায়—থাক্, আগুনের তাপে শরীর খারাপ হলে তখন দেখবে কে? আমিই করছি।

...সীমা সকালে উঠে শুনেছে খবরটা।

বেয়ারা বলে—সাব তো রাতভোরে বের হয়ে গেছেন মাছের বাজারে। কি কাজ আছে।

সীমা চুপ করে কি ভাবছে.

নিমাইকে চিনেছে ক'মাসেই, ওর কাছে টাকা আর ব্যবসাই বড়। স্ত্রীর কোন মর্যাদাই দেয়নি তাকে নিমাই। ও যেন তার কাছে একটা আসবাবের মতই প্রাণহীন সম্পদ। প্রয়োজনে ব্যবহার করে আবার সরিয়ে দেয়। তিলে তিলে এই অবহেলা অপমান সয়েছে সীমা।

বি-এ অনার্স নিয়ে পাশ করেছিল, চাকরীও পেয়েছিল ওখানের মেয়েদের স্কুলে। কিন্তু নিমাই, ওর মা দাদা কঠিন স্বরে প্রতিবাদ জানায়—ঘরের বৌ চাকরি করতে যাবে কি গো? ঘরে কি খাবার

নাই, না ঘোষবাড়ির মান ইজ্জত নাই ?

শাশুড়ী শোনায়—এখানে থেকে ওসব হবে না।

নিমাই গর্জায়—ডানা পালক ছেঁটে দেবে। বাইরে না বেরুলে নাগরদের সঙ্গে দেখা হবে কি করে ?

সীমা চুপ করে সেই অপমানটা সহ্য করেছিল।

এমনি করেই দিন কেটেছে তার। এখানে এসেও সীমা এই অবজ্ঞা সহ্য করে চলেছে।

...কি ভেবে নেমে এল শাড়িটা বদলে।

সকালের আলোয় ঝলমল করছে দীঘার ঝাউবন, সমুদ্রের জল,—লোকজন বেড়াতে বের হয়েছে।

কি ভেবে সীমা রিক্সাওয়ালাকে বলে—রতনপুর নিয়ে যেতে পারবে ?

রিক্সাওয়ালা বলে, চলুন—

শহরের সীমা এখন মুছে মুছে আসছে। পিচঢালা পথ, বাঁদিকে সমুদ্রের পাড়ে ঘন ঝাউবন, এদিকে উঁচু বালিয়াড়ির উপর দু-চারখানা বাড়ি, একটা বড় পুকুর মত।

রিক্সাওয়ালা শুধায়—রতন পুরে কোথায় যাবেন ?

ঠিকানাটা জানেনা সীমা। বলে—বিজনবাবুকে চেনো ? ওখানে থাকেন।

রিক্সাওয়ালা কি ভেবে বলে--মাস্টারবাবুর কথা বলছেন ? আশ্রমেই তো থাকেন তিনি। চলেন।

আশ্রম, মাস্টার এসব খবর ঠিক জানেনা সীমা। বিজনের সঙ্গে কাল হঠাৎ দেখা হওয়ার পর এসব খবরও নিতে পারেনি। তাই মনে হয়, এ কোন্ বিজনবাবু কে জানে। তবু দেখা দরকার। তাই সীমা বলে।

--হ্যাঁ। ওখানেই চলো।

পিচরাস্তা থেকে ডানহাতি পথটা বেঁকে গেছে। বালিয়াড়ি, সবুজ ঝাউবন, কাজুবাদামের বনের মধ্য দিয়ে রাস্তাটা চলেছে। শান্ত নির্জন

পরিবেশ। সামনে সবুজ গ্রামসীমা, এ যেন অন্যরূপ এখানে। দীঘার মত আধুনিক রূপ, উদগ্র প্রসাধন নিয়ে মেয়েছেলেদের জটলা এখানে নেই। কলরববিহীন শান্ত পাখিডাকা গ্রামীণ পরিবেশে একটা পুকুরের ধারে সাজানো নারকেল-সুপারী-আম গাছের বাগানে এসে পড়েছে।

মাঝে মাঝে দু'চারটে কুটিরের মত। সামনে গাঁদা-ডালিয়া, কিছু মল্লিকা-অতসী-চাঁপা গাছের ভিড়। দু'একটা কুটিরের সামনে বাঁশের গেটে বোগেনভিলার সবুজ ডালে ঘনপুঞ্জ লাল ফুলের সমারোহ।

ছেলেদের পড়ার শব্দ কানে আসে পাখির ডাক ছাপিয়ে। এদিক-ওদিকে ছড়ানো ঘরগুলো। তার মধ্যে একটা একতলা পাকা বাড়ি। সামনে চওড়া বারান্দা। চারিপাশে ফুলের বাগান।

রিক্সা থেমেছে, সীমা নেমে চারিদিক দেখছে। শান্ত সুন্দর তপোবনের পরিবেশ। উদগ্র দীঘায় জমায়েত হয় সারা বাংলা কলকাতার উৎকট আধুনিক সমাজ, এখানে তার ছোঁয়া নেই।

—তুমি!

কার ডাকে চাইল সীমা। সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিজন।

কলকাতার সেই আয়েসী চেহারা আর নেই বিজনের। ঋজু কঠিন একটি মানুষ। চোখে শেলফ্রেমের চশমা, চোখে মুখে বুদ্ধির মার্জিত ছাপ। পরনে খদ্দরের পাঞ্জাবি, ধুতি—গায়ে একটা চাদর জড়ানো।

বিজন দেখছে বিস্মিত সীমাকে।

বলে সে—এসো।

অপিসে নিয়ে এসেছে সীমাকে।

বিজন বলে—হঠাৎ তুমি আসবে এখানে তা ভাবতে পারিনি।

সীমার চোখে অসহায় অশ্রু নামে।

অবাক হয় বিজন—সীমা!

সীমা বলে—জীবনে মস্ত একটা ভুলই করেছি বিজন, সেদিন বুঝতে পারিনি। তোমাকেও আঘাত দিয়েছিলাম। আজ সেই ভুলের মাশুল যোগাতে গিয়ে আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি বিজন!

বিজনও কিছুটা বুঝেছে সেটা।

তবু আজ তার বলার কিছু নেই। বলে সে—এ নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই সীমা। সবকিছুকে মেনে নিয়েই চলতে হবে। আমিও দুঃখ সেদিন পাইনি তা নয়, তবু জেনেছিলাম একে মেনে নিয়েই চলতে হবে। আজ সেই চেষ্টাই করেছি। ফিরে এসে বাবার সম্পত্তিগুলোকে এইভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছি।

সীমা চুপ করে কি ভাবছে।

বিজন আজ পথ পেয়েছে। এখানে গড়ে তুলেছে একক প্রচেষ্টায় সুন্দর একটি প্রতিষ্ঠান। স্কুল—ছাত্রাবাস—বালিকা বিভাগ। ওদিকে বাগানের মধ্যে বড় শেডে তাঁত-এর কাজ চলছে; শাড়ি—অন্যান্য সবই তৈরী হয়।

স্কুলের বাগানের পর বিরাট ক্ষেত—ধান, শাকসব্জীও হয় সবই।

বিজন বলে—আমাদের সবকিছু নিজেরাই করি। ক্ষেতের ধান-শাকশব্জীতে চলে যায়। তাঁতের কাপড় চাদর গামছাও কুলিয়ে যায়। সকলের সমবেত চেষ্টায় স্কুল মোটামুটি চলে যাচ্ছে। এবার গার্লস হাই-স্কুলের নাইন-টেন ক্লাসও খুলছি।

ছোট্ট সুন্দর একটি প্রতিষ্ঠান, যেন একটি বৃহৎ পরিবারের সবাই এরা। এর মধ্যে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকারাও রয়েছেন। সীমা মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই সবুজ পরিবেশে সুন্দর জীবনকে দেখছে।

শিশুকণ্ঠের কলকাকলি ওঠে বাগানে।

বিজন আজ নিজের জগতে কি শান্তির সন্ধান পেয়েছে! সীমার মনে হয় সে কোথায় নিদারুণ ভাবে হেরে গেছে। সব পাওয়া তার ব্যর্থ হয়ে গেছে। জীবনের এই ভুলটার প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় সে।

নিমাইকে মেনে নিতে পারেনি। ওই বন্দী জীবনের মধ্যে থেকে সীমা নিজেকে অপচয়িত করছে। • ব লেখাপড়া, বুদ্ধি সবকিছুই মূল্য-হীন হয়ে যাবে। তারও করার কিছু আছে। ওই পরিবেশে বন্দী থেকে সে ফুরিয়ে যেতে পারবে না।

সীমা বলে—আমাকে এখানে একটা কাজ দাও বিজন?

বিজন চাইল ওর দিকে। একটু অবাকই হয়েছে সে।

বিজন বলে—এ কি বলছো সীমা ?

সীমা বলে—ঠিকই বলছি বিজন। এতদিন যাকে সবচেয়ে বড় বলে ভাবতাম সেটা যে অত্যন্ত মূল্যহীন, অসার, শুধু বেদনাদায়কই এটা বুঝেছি। তাই ওই জীবন থেকে সরে আসতে চাই। সত্যিকার কোন কাজে লাগতে চাই।

বিজন কি ভাবছে। এবার সে জানায়।

—এ কাজও দু'দিন পর মূল্যহীন মনে হবে সীমা। সেদিন এ ভুলের মাশুল দিতে জীবন অসহ্য হয়ে উঠবে। তাই বলছিলাম ক্ষণিকের মোহে কোন সিদ্ধান্ত নিও না। মনকে প্রশ্ন করো—বুঝে দেখো, তারপর যা হয় সিদ্ধান্ত নিলে বোধহয় ভালো করবে।

ছায়া নামে বাগানে। বাতাসে ফুলের সৌরভে মিশেছে ভ্রমরের গুঞ্জরণ। সীমা বলে—আমাকে এড়াতে চাও তুমি ?

বিজন বলে—না। তোমার ভালোর জন্যই কথাটা বললাম। চলো, বেলা হয়ে গেছে। দুপুরে এখানে খেয়ে যাবে। খাওয়ার বিলাসও যে আমাদের সাধ্যাতীত সেটাও জানা দরকার।

…একটা লম্বা শেডে মাদুরের ছোট ছোট আসন পাতা।

থালায় গরম ভাত ডাল আর কুমড়ো আলু বেগুন কফি সব দিয়ে পাঁচমিশেলী তরকারী, টম্যাটোর চাটনী, আর শেষ পাতে ওদের গোয়ালের গরুর দুধের দই। আয়োজন সামান্যই তবু সীমা তৃপ্তি করে আজ খায়।

মনে হয়, তার প্রাচুর্যের দৈন্য থেকে এখানে নিরন্নতার গৌরব অনেক বড়। আজ সীমার মনে এই প্রশ্নই বড় হয়ে উঠেছে।

খুশিমনে ফিরছে নিমাই।

এখান থেকে কলকাতার ফোনের লাইন পাওয়া যেন ভাগ্যের কথা। ঘণ্টা তিনেক চেষ্টা করে লাইন পেয়ে মাছ পাঠানোর খবরটা দেয় আড়তে। দরও শুনেছে কলকাতার। মাছের চালান তেমন নেই। দর অনেক। ফলে তার হাতে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা মার্জিন থাকবে এক

চালানে। টাকাও আসছে। নিমাই কালও গস্ত করবে মাছ।

কাজ শেষ করে এবার নিশ্চিন্ত হয়ে বাইরে আসে।

বেশ বেলা হয়ে গেছে। সমুদ্রে স্নানার্থীদের ভিড় জমেছে। ওই ঢেউ-এর বুকে কেউ লাফাচ্ছে, কেউ কলরব করে —ঢেউটা ভেঙ্গে পড়ছে বেলাভূমিতে। অনেক ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতীরাও নেমেছে জলে। ভিজে গেছে শাড়ি, বুক। ভিজে কাপড়ে তাদের যৌবন যেন উদ্দাম হয়ে উঠেছে ওই বাঁধনহারা সমুদ্রের ঢেউগুলোর মতই।

নিমাই-এর খেয়াল হয়, সেও আসবে সমুদ্রস্নানে সামাকে নিয়ে। বেচারা একলা পড়ে আছে ট্যুরিস্ট লজে। সীমার যৌবনবতী দেহটাকে ভিজে কাপড়ে কেমন দেখাবে তাই ভাবছে। সেই সম্পদটা ভোগ করার অধিকার একা তারই।

নিমাই এগিয়ে যায় সামনের বাগানঘেরা ট্যুরিস্ট লজের দিকে। তাদের ঘরের তেতলার ব্যালকনিটা দেখা যায়। সীমাকে সেখানে দেখা যায় না। উঠে যাচ্ছে নিমাই, রিসেপসনিস্টের ডাকে চাইল।

—চাবিটা নিয়ে যান স্যার। উনি একটু বেরিয়েছেন চাবি রেখে দিয়ে।

নিমাই একটু অবাক হয়। একাই বের হয়েছে সীমা তাকে না জানিয়ে। হয়তো বাজারে, এদিকে ওদিকে গেছে। নিমাই চাবিটা নিয়ে উঠে গেল ক্ষুণ্ণ মনে। তাকে না বলে, তার জন্য অপেক্ষা না করে বের হয়ে গেছে সীমা একাই, নিমাইকে অপমান অবহেলাই করেছে নিদারুণ ভাবে সীমা। নিমাই আজ নগদ বিশ হাজার টাকা রোজগার করেছে, তিন-চারদিনে সে পঞ্চাশ হাজার টাকা রোজগার করবে এখানে। তার নিজের এতবড় এলেম, অথচ তাকে এভাবে অপমান করবে একটা তুচ্ছ মেয়ে দু'পাতা পড়াশোনা করেছে এই অহঙ্কারে? নিমাই জানে টাকাই সবচেয়ে বড় জোর. সেই জোর তার আছে। তাই অমন মেয়েকে সে পায়ের নীচে ফেলে পিষতে পারে! তাই করবে সে।

ঘরের মধ্যে পায়চারী করছে নিমাই, কি ভেবে বের হল। যদি সীমাকে বাজারে পথে কোথাও পাওয়া যায় তাই দেখবে। এর বিহিত করবে আজ।

…বাদল রায় সকাল থেকেই হোটেলের বাগানে বসে আছে। সকালে একবার লতিকার সঙ্গে বের হয়েছিল। লতিকা বলে—সকালে বেড়াতে বলেছেন ডাক্তার। ডায়েটিং-এর সঙ্গে ওয়াকিং-ও করতে হবে। চলো—

বাদল রায়কে ওর স্ত্রী আদেশ করে।

ওর সঙ্গে বের হতে হয়।

লতিকা সকালেই ঠোঁটে মুখে প্রসাধন করে বের হয়েছে দামী শাড়ির উপর সোয়েটার, কাশ্মিরী শাল চাপিয়ে। ঝাউবনের ধারে তখন ভ্রমণার্থীদের ভিড় জমেছে।

লতিকা বালিপথে বিশাল দেহটাকে টেনে চলার চেষ্টা করে।

কয়েক মণ ভারি দেহটা, পা দুটো বালিতে চেপে বসছে। বারবার পরিশ্রম করে ওই বিপুল দেহলতাকে টেনে তুলতে হচ্ছে। হাঁপাচ্ছে লতিকা। বিশাল দেহটা ঘামছে, সোয়েটার খুলে ফেলেছে। শালও।

দু'চারজন ভ্রমণার্থীও দেখছে লতিকার ওই গলদঘর্ম অবস্থাটা।

বাদল রায় বিপদে পড়ে, শুধোয় সে।

কষ্ট হচ্ছে লতা ?

লতিকা তখন কুয়াসা-ভিজে বালিতেই বসে পড়ে জানায় হাঁপাতে হাঁপাতে

—না! জাস্ট টায়ার্ড।

বাদল রায় দেখছে চারিদিকের কৌতূহলী জনতাকে। অনেকেই লতিকার দিকে চেয়ে আছে। ঘামে ওর মুখের রং গলছে—চটা ওঠার মত কদয অবস্থা হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ ওই ভিড়ের মধ্যে চোখে পড়ে রমেনকে।

রমেন কাজলকে নিয়ে সকালেই বের হয়েছিল সমুদ্রের ধারে। কাজল মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছে ওই সূর্যোদয়। বালুচরে লোকজনের কলরব ওঠে।

ওই অবস্থায় বাদল রায়ের সঙ্গে লতিকাকে দেখে ব্যাপারটা বুঝে নেয় রমেন। কাজলকে এ সময়ে দেখানো ঠিক হবে না।

রমেন বলে—কাজল তুমি একটু ওই চায়ের দোকানে গিয়ে বসো, আমি আসছি এখুনি।

কাজল একটু অবাক হয়।

রমেন ততক্ষণে এগিয়ে গেছে, বাদল রায়ের মিসেস ওই লতিকাও চেনে রমেনকে। দায়ে অদায়ে আসে রমেন। তাছাড়া লতিকা রমেনদের ক্লাবের চিফ্ পেট্রন। পয়সাকড়িও দেয়।

রমেন এগিয়ে যায়—নমস্কার বৌদি! হঠাৎ শরীর খারাপ হল নাকি?

লতিকা চাইল—তুমি এখানে?

রমেন-এর দিকে বাদল রায়ও চাইছে ওর চোখে ভয়-ভয় ভাব। কে জানে তার সব কুমতলবের কথাই বোধ হয় ফাঁস হয়ে যাবে এইবার।

কিন্তু রমেন আরও সাবধানী। সে বলে—দু'তিনজন বন্ধুর পাল্লায় পড়ে দীঘা বেড়াতে এসেছি, হঠাৎ আপনাদের দেখে এদিকে এলাম। শরীর খারাপ হয়নি তো?

লতিকা ততক্ষণে কিছুটা সামলেছে। বলে সে—না। সে সব কিছু নয়। চলো, হোটেলে ফিরতে হবে

বাদল রায় উঠেছে। অসহায়ের মত চাইছে। ওই বোঝা তাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে আবার! রমেনই বলে—চলুন। আমিও সঙ্গে যাচ্ছি বৌদি। যা বালি এদিকে, পা দেবে যাচ্ছে, হাঁটতে পারবেন না। বরং বাঁধে উঠে চলুন।

বাদল নিশ্চিন্ত হয়। রমেন-এর কাঁধে ভর দিয়ে লতিকা হাঁসফাস করে বাঁধে উঠলো কোন রকমে। শক্ত মাটি পেয়ে এবার কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে সে। একটু দূরেই হোটেলের পেছনের বাগানের রাস্তা।

লতিকাকে হোটেলের বাগানে এনে একটা ডেকচেয়ারে বসিয়ে রমেন হাঁকডাক করে এক গ্লাস কোল্ড ড্রিঙ্ক এনে ওকে ধাতস্থ করে বলে—গাড়িতে ঘোরা অভ্যেস, বৌদি। এভাবে পায়ে হেঁটে চলাফেরা

কি সহ্য হয় ?

লতিকা কোল্ড ড্রিঙ্ক গলায় ঢেলে এবার একটু সামলে নিয়ে বলে —সত্যি ! ন্যাস্টি হ্যাবিট ওই পায়ে-হাঁটা । ওসব আমার ধাতে সয় না ।

রমেন বলে—তাহলে রেস্ট করুন । কি বাদলদা, সিগ্রেট কিনবেন বলছিলেন ?

বাদল রায় বুঝেছে বাইরে যাবার ইঙ্গিতটা । রমেন এ বিষয়ে বেশ চালাক-চতুরই । বাদল বলে—হ্যা । আর কিছু ফ্রুট্‌স আনতে হবে তোর বৌদির জন্য । হোটেলের ফল যা দেয় বাজে । কাজুবাদামও আনতে হবে ।

বাদল রায় স্ত্রীর যেন অনুমতি ভিক্ষা করছে । বলে সে ।

—তাহলে একটু ওসব নিয়ে আসবো ?

লতিকা বিশাল ঘাড় নেড়ে বলে—যাও, দেরী কোরো না কিন্তু ।

বাদল রায় আর রমেন বের হয়ে আসে বাইরে ।

মুক্তি পেয়েছে যেন কিছুক্ষণের জন্য বাদল রায় । রমেন বলে গলা নামিয়ে ।

—এই ফাঁকে একবার মালটাকে দেখে নিন বাদলদা ।

বাদল রায় গজরায়—উঃ ! যেন হাজতে বাস করছি । গাড়ি এলে ওকে কালই বিদেয় করে দোব কলকাতায় । দুদিন আরাম করে এখানে থাকছি । বুঝছি রমেন, লাইফ মিজারেবল করে দিল রে !

রমেন বলে—কাল সকালেই তো পাচার করছেন দাদা, লাইন কিলিয়ার । ব্যাস, তারপর দুদিন এন্‌জয় করুন । তবে দাদা, একটু রয়ে সয়ে এগোবেন কিন্তু । নোতুন জিনিস—প্রথমেই এ্যাটাক করলে ভড়কে যাবে । একটু খেলিয়ে তারপর—

বাদল রায়-এর দোষগুলো জানে রমেন । তাই হুঁসিয়ার করে দেয় ।

বাদল রায় বলে—ওসব ঠিক আছে ।

রমেন স্মরণ করিয়ে দেয়—তবে চাকরীর কথাটা কিন্তু ঝেড়ে ফেলোনা মাইরী ।

ওর জন্যই এত কাণ্ড ।

বাদল রায় তাও জানে, আর এও জানে, কি করে এস বট্যাক্‌ল করতে হয়। বাদল রায় বলে—এ নিয়ে তুই ভাবিস না। সব ম্যানেজ করে দেব।

সমুদ্রের বালিয়াড়ির উপর দু'চারটে বেঞ্চ পেতে চায়ের দোকান লাগিয়েছে। দু'চারজন ছেলেমেয়েও বসে চা খায়। ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে কথাবার্তা বলে। এসব কথার যেন শেষ নেই।

কাজল দেখছে এখানে কতো ছেলেমেয়ে আসে। বিয়ে-করা স্বামী-স্ত্রী ওরা নয়। সমাজের এ খবরটা তার জানা ছিল না। ওদের চোখ-মুখের ভাব, ঘনিষ্ঠ মেলামেশায় কাজল মনে মনে কী অজানা ভয়ে ভীত হয়ে উঠেছে। একাই বসে আছে কাজল। দু'একটা ছেলে দু'একটা মন্তব্যও ছুঁড়ে দিয়েছে। —একা নাকি গো ?

কাজল জড়সড় হয়ে বসে আছে। কোন সাড়া দেয়না।

হঠাৎ রমেনকে দেখে চাইল। সঙ্গে সুবেশধারী একটি ভদ্রলোক। রমেন বলে—দেরি করিনি তো ?

কাজল চাইল। রমেন বলে—ক'জল, ইনি মিঃ রায়, বিরাট কার খানার মালিক। দীঘায় এসেছেন কি কাজে। দেখা হয়ে গেল।

কাজল নমস্কার করে।

রমেন বলে—এর কথাই বলছিলাম দাদা। লেখাপড়াতে খুব ভালো। টাইপ-ফাইপ জানে, একটা কাজকর্ম দিন না ? বড় উপকার করা হবে।

বাদল রায় দেখছে কাজলকে।

ফর্সা ধারালো চেহারা। সুঠাম দেহের রেখাগুলো মুখর হয়ে উঠেছে। ডাগর চোখে শান্ত নম্রতা। নিটোল হাত—মসৃণ কাঁধ ওর রূপকে যেন প্রোজ্জ্বল করে তুলেছে। লোভনীয় চেহারা।

বাদলের অতৃপ্ত মন কি স্বপ্ন দেখে !

রমেনও দেখছে বাদল রায়কে। সে চেনে ওই চাহনি। নীরব চাহনিটা যেন কাজলের দেহটাকে চেটেপুটে ভোগ করার ব্যাকু-লতায় আকুল। টোপ ধরেছে। রমেন বলে চলেছে—কথাটা একটু মনে

রাখবেন দাদা। বাদল রায়ের হুঁস ফেরে। এবার বলে সে।

—চাকরী? দেখি কি হয়। দু'একদিন আছি, কলকাতার অফিসের সঙ্গে ফোনে কথা হবে। কি পজিশন জানা দরকার। তুই বরং পরে যোগাযোগ করবি।

রমেন বলে—একা আমি কেন, ওই কাজলও দেখা করবে। কি কাজল? চাকরীর ব্যাপার তোমার—তোমাকেও বুঝে নিতে হবে বাপু। আমি ওসব বুঝিটুঝি না।

কাজল আশার আলো দেখছে। চাকরী হলে বেঁচে যাবে সে। তাই বলে—তাই হবে।

—কিন্তু কোথায় যেতে হবে?

রমেন বলে—সে খোঁজ নিয়ে রাখবো। আর বাপু দীঘা তো এইটুকুন, সি-বীচেই দেখা হয়ে যাবে।

বাদল রায় প্রথম ধাপ এগিয়েছে। এরপর ব্যাপার বুঝে সে নিজের পথ করে নেবে। তাছাড়া রমেন তো রয়েছেই। বাদল রায় বলে।

—তাহলে চলি রমেন। হোটেলে জরুরী ফাইলপত্র দেখতে হবে।

—বেড়াতে এসেও নিশ্চিন্তি নাই দাদা? রমেন বলে।

হাসল বাদল রায়। কাজল নমস্কার জানায়। বাদল রায় চলে গেল।

রমেন এবার কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। বাদল রায়ের নজরে লেগেছে। কাজলের চেহারার দাম আছে। এবার মোচড় মেরে কিছু রোজগার করে নেবে সে। কাজলও চাকরীর জন্য এগিয়ে যাবে।

রমেন খুশি হয়ে বলে।

—বসো কাজল, চাকরীর চেষ্টা তো করেছি, এখন তোমার বরাত। কই হে, বেশ যুৎ করে দু'কাপ চা দাও দিকি?

কাজল বলে—অ্যাই, বেলা হয়ে গেছে কতো, হোটেলে ফিরবে না?

রমেন বলে—চা তো খাও। তারপর ধীরে সুস্থে চান-টান করে ফেরা যাবে।

কাজলের সামনে সমুদ্রে স্নান করছে ছেলেমেয়ের দল। ওদের ভিজে বে-আব্রু দেহের দিকে নজর নেই। কি খুশিতে ওরা কলরব করছে।

কাজল তার দেহের ওই অবস্থার কথা ভেবে যেন চমকে ওঠে সলজ্জভাবে বলে—এইভাবে চান করতে হবে? শুকনো কাপড় তো আনিনি।

হাসে রমেন—সবতাতেই তোমাদের লজ্জা। চলো তো। সবাই এমনিই চান করছে। রমেন ওর সব লজ্জা যেন ভাঙাতে চায়।

…কইগো, আসো? দেহি চলতেই পারো না?

বালিতে নেমে হাঁক পাড়ছে হরিপদ সরকার, বীরদর্পে সমুদ্র-স্নানে চলেছে সে তার দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী মণিমালাকে নিয়ে। হরিপদ সরকার কাল থেকে দীঘায় এসে যেন হঠাৎ বদলে যাচ্ছে।

এতদিন ধরে সে ব্যবসা নিয়েই ভেবেছে। কলকাতার পোস্তার বস্তির মধ্যে বসে আলু-পেঁয়াজ-মশলার দর যাচাই করেছে, গলদঘর্ম হয়ে জাবেদা খাতায় পিঁপড়ের সারবন্দী লাভ-ক্ষতির হিসাব করে লাভের কড়ি ঘরে তুলেছে।

এর বাইরের কোন জগৎকে হরিপদ দেখেনি। মণিমালাকে দ্বিতীয় বার বিয়ে করে ঘরে এনেছিল সংসার সামলাতে মাত্র। রাত্রি দশটার পর বাড়ি ফিরে ইষ্টনাম জপ করে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়তো। আবার ভোরে উঠে গঙ্গাস্নান পুজো-পাট সেরে বের হতো বাজারে।

কাল থেকে এখানে এসে হঠাৎ এই বিশাল মুক্তির মাঝে নিজেকে যেন নোতুন করে খুঁজে পেয়েছে। বৈকালেই বের হয়েছিল ঝাউবনে সমুদ্রতীরে। তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে দূর সমুদ্রে। বাজারের লাভ-লোকসানের হিসাব এখানে নেই। লোকের সঙ্গে দরদামের ইশারার ভাবা নেই

মুক্তি। মন থেকে সব যেন ঝেড়ে ফেলেছে সে। অনেক হালকা-সহজ বলে বোধ হয় দিনটা।

হরিপদ সরকার বলে—বুঝলা মণিমালা, আজ মনে হয় খাটতি-খাটতি শেষ হই গেলাম। ছুটি কারে কয় সেডা বুঝিনি।

মণিমালা দেখছে লোকটাকে।

যেন নোতুন মানুষ সে। সন্ধ্যা নামছে দীঘার সমুদ্রতীরে। বালিচরে ছোট ছেলেমেয়ের দল ভাড়া-করা ঘোড়ায় চেপে ভিজে বালিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মণিমালা চেয়ে থাকে—তার কোন ছেলে-পুলে নেই। থাকলে এত বড়ই হোত।

একটা চাপা দুঃখই রয়ে গেছে মণিমালার মনে।

সরকারমশাইয়ের ডাকে চাইল।

—চলো যাই গিয়া। ছুটি পাইছি, ঠাকুরের নাম তো করার লাগবো।

...আসো!

হরিপদ সরকার ধুতিটাকে সেঁটে পরেছে। কোমরে একটা গামছা জম্পেশ করে বাঁধা, খালিগায়ে চপচপে করে সর্ষের তেল মেখেছে। পিছনে আসছে মণিমালা শাড়িটাকে শক্ত করে পরে কোমরে গামছা বেঁধেছে।

খুশিতে সেও আত্মহারা।

ঢেউগুলো ভাঙছে। একটার পর একটা ঢেউ আসে, মাথায় ফেনার রাশ, সশব্দে আছড়ে পড়ে আর কলরব ওঠে ছেলেমেয়েদের।

হাক পাড়ে সরকারমশাই নাকানিচোবানি খেয়ে—কই গেলা অ নোতুনবউ!

মণিমালা এর মধ্যে মেয়েদের ভিড়ে মিশে গেছে।

ওরই মধ্যে পুরুষদের ভিড়ের একটু দূরে কিছু মেয়ে নেমেছে সমুদ্রে। কাজলও সেইখানে নেমেছে। রমেনের সঙ্গে ওইভাবে স্নান করতে পারেনি সে। ভিজে গেছে জামাকাপড়—নিটোল পুরুষ্ট গায়ে চেপে বসেছে। জলে নেমেছে মিনতিও।

ভবতারিণী আসেনি। মিনতি এসেছে। ঢেউগুলো ভাঙছে কোমরের কাছে, প্রচণ্ড জলস্রোত যেন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে। সেই ঢেউগুলো ফেরার সময় যেন পায়ের নিচের বালিটকুকে নিয়ে ফিরবে।

দোলনায় যেন ওঠা-নামা করছে। কি কৌতুকে আনন্দে হেসে চেনা-অচেনা এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে! এমন সময় হরিপদ সরকারের ব্যাকুল ডাক শুনে চাইল মিনতি। মণিমালাকে বলে সে,

—ডাকছেন উনি।

মণিমালা কৌতুকের হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলে,

—ডাকুক গে। তা কলকাতা থেকেই তো এলেন দেখলাম?

মিনতি ঘাড় নাড়ে। কাজলও পাশেই রয়েছে। মিনতি শুধোয় ওকে,

—তোমাকেও তো ভাই দেখলাম সেদিন বাসে? না?

কাজল বলার চেষ্টা করে,

—হ্যাঁ। দীঘা দেখিনি। দাদা আসছিল, ওর সঙ্গে চলে এলাম। কাজল সহজভাবেই কথাটা জানাবার চেষ্টা করে। মিনতি শুধোয়,

—থাকবে তো দু'চারদিন?

কাজল বলে—দেখি ক'দিন ছুটি আছে দাদার।

ঢেউগুলো উঠে আসছে কালো প্রাচীরের মত। ওরাও তৈরি। ঢেউ আছড়ে পড়ে।

এবার ছিটকে পড়েছে অতর্কিত আঘাতে মণিমালা, তারপরই একটা বেতালা ফিরতি ঢেউ ওকে টেনে নিয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। কাপড়-চোপড় এলোমেলো হয়ে পায়ে আটকে গেছে। ঢেউয়ে যেন তলের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে। চীৎকার করে ওঠে মণিমালা। সারা ঘাটে সাড়া পড়ে যায়। এমন কাণ্ড ঘটে দীঘার সমুদ্রে, দু'একজন মারাও যায়। চীৎকারে রমেন লাফ দিয়ে পড়ে- সে ভাসমান মেয়েটিকে ধরে টেনে আনে। লোকজন জুটে যায়।

হরিপদ সরকার ছুটে আসে। ব্যাকুল কণ্ঠে চীৎকার করে সে,

—নোতুনবউ!

মণিমালার তেমন কিছু হয়নি। হুঁসও রয়েছে।

অসংযত বেশবাস ঠিক করে উঠে বসলো। কে বলে—খুব বেঁচে গেছেন! ভিড় জমেছে। কোন ছোকরা শোনায়—এখুনি বুড়োবয়সে দিদিমাকে হারাতেন, দাদু।

হরিপদ সরকার ব্যাকুল ভাবে শুধোয়—কিছু হয়নি তো!

মণিমালাও লজ্জায় পড়ে গেছে। বলে সে—না, না।

হরিপদ সরকার বলে—চলো। ঢের হইছে। তখুনি কইলাম কাছ ছাড়া হইও না। ভয় লজ্জা! চলো গিয়া।

মণিমালা ভিজে কাপড়েই ফিরছে। হরিপদ সরকার তখনও গজগজ করে—গুরু রক্ষা করছেন, না হলে কি সব্বোনাশ হইতো কও দেহি? জয় গুরু!

...কাজল মিনতি আরও অনেকে চেয়ে আছে ওদের দিকে। কাজল বলে—বুড়োর কিন্তু গিন্নীর জন্যে খুব টান!

হয়তো এমনি নিঃশেষে একজন অন্যজনকে অবলম্বন করে ঘর বাঁধতে চায়, বাঁচতে চায়। মিনতির মনে হয় তাব পাশে এমন কেউ নেই।

বলে মিনতি—স্ত্রী তো! স্বাভাবিক ব্যাপারই।

কাজল চাইল। বলে—দোজপক্ষের স্ত্রীর আদব কিন্তু বেশি।

মিনতি হেসে বলে—তাহলে তুমি কি তেমনি বরের সন্ধানে আছো?

কাজল বলে—বর তো পরের কথা! এখন একটা চাকরি পেলে বাঁচি। মানে, দাদাদের ঘাড়ে বসে খাচ্ছি তো, নিজেরই বিশ্রী লাগে।

ওর কথায় কি বেদনার সুর ফুটে ওঠে!

মিনতির খেয়াল হয়, বেলা হয়ে গেছে।

মা রান্নার কাজে রয়েছে। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

সমরও এসে গেছে বোধ হয়। মিনতি বলে কাজলকে,

—আজ উঠি ভাই, পরে দেখা হবে। কটেজে উঠেছি—এসো একদিন। তিন নম্বরে আছি। কাজলেরও ভালো লেগেছে মিনতিকে। বলে সে,

—হ্যাঁ। কটেজগুলোকে দেখেছি। যাবো একদিন। আর কলকাতার ঠিকানাও নিয়ে রাখবো। সেখানে দেখা হবে। আর চাকরির কথাটা মনে রাখবেন কিন্তু!

হাসে মিনতি। বলে সে,

—চাকরি দিতে কি আমি পারবো ভাই? তবু এলে খুশি হবো।

উঠে পড়ে সে। বালিচর ধরে ফিরছে তাদের কটেজের দিকে।

…ঘরটার বাইরের দরজা বন্ধ করলে সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ। ওদিকে লাগোয়া বাথরুম, জলের অভাব নেই। শাওয়ারও রয়েছে।

হরিপদ সরকার স্ত্রীকে নিয়ে নিজের স্যুটে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে, চাইল মণিমালার দিকে।

মণিমালার নিটোল যৌবনপুষ্ট দেহের রেখাগুলো ভিজে-শাড়ির আবেষ্টনীতে মুখর প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। মুখটা জলে ভিজে টস্‌টসে, কমনীয়। ডাগর চোখে চাপা হাসির আভা।

মণিমালা বলে—যার দিকে এতদিন ফিরেও চাওনি, সে সমুদ্রে ডুবলে তোমার কি এমন ক্ষেতি হতো? আপদ যেতো!

হরিপদ সরকার চাইল স্ত্রীর দিকে।

এত বড় খবরটা তারও জানা ছিল না। চারবছর বিয়ে করে এনেছে মণিমালাকে, আজ দেখেছে তাকে নোতুন করে, চিনেছে নিজেকেও। এগিয়ে আসে হরিপদ। —কি বলছো নোতুনবউ? না—না! বিশ্বাস করো এভাবে কোনদিন ভাবিনি। ভাবতে পারিনি। আজ মনে হয় ভুলই করে এসেছি, মালা!

মণিমালা দেখছে মানুষটাকে।

হরিপদ স্ত্রীর নিটোল দেহটাকে কাছে টেনে নেয়। ওর দেহের স্পর্শ ঝড় তুলেছে হরিপদের সারা মনে। মণিমালাকে নিবিড়ভাবে কাছে নিয়েছে হরিপদ, তার দেহে মনে আজ নোতুন করে উন্মাদনা জাগে, ঝড় ওঠে। মণিমালাও সারা মন দিয়ে এমনি করে মানুষটাকে কাছে চেয়েছিল। আজ সেও বাধা দেয় না। আধো আলোছায়ার

মোহমদির পরিবেশে ছুটি বুভুক্ষু নরনারী যেন কি নোতুন মন নিয়ে পরস্পরকে কাছে পেয়েছে!

মণিমালার চোখ ছেয়ে কি আবেশ নামে!

…ঝাউবনে সমুদ্রের হাওয়া কাঁপছে। বালিয়াড়ির বুকে সেই ঝড় বালিকণার বুকে উধাও হবার সাড়া এনেছে। মিনতি ফিরছে।

বালিচর থেকে বাঁধে উঠে বালিয়াড়ি পার হয়ে আসছে। জায়গাটা ঝাউবনের ছায়া ঢাকা। বালিতে ওড়কলমার সবুজ লতার বুকে বেগুনী রঙের অসংখ্য ফুল ফুটে আছে। হঠাৎ কার ডাকে চাইল।

সমরই বলে—নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে নিজেই উধাও!

মিনতি চাইল ওর দিকে। ভিজে কাপড়টা চেপে বসেছে দেহে। জামাকাপড়ের বাঁধন ছাপিয়ে একটি বরতনুর অপরূপ রূপকে হঠাৎ দেখেছে সমর! মিনতি তোয়ালে দিয়ে বুকপিঠ ঢাকার চেষ্টা করে বলে,

—চান করতে গেছলাম। কতক্ষণ এসেছেন?

সমর বলে—প্রায় আধঘণ্টাটাক। আর সমুদ্রস্নানে গেছ জানলে আমিও যেতাম। একসঙ্গেই জলে নামতাম।

—ধ্যাৎ!

মিনতির ফর্সামুখে সলজ্জ রক্তিম আভাস জাগে। হাসছে সমর

মিনতি বলে—আসুন।

দরজার মুখে সমর বলে—তুমি যাও, সিগ্রেটটা শেষ করে যাচ্ছি। মাসীমার সামনে এটা নাইবা খেলাম।

—অ! একটু হেসে মিনতি ভিতরে চলে গেল।

…ভবতারিণী খেতে দিচ্ছে ওদের। ঘেরা বাড়ির বারান্দায় মধ্যদিনের রোদ কবোষ্ণ আবেশ এনেছে। মিনতির পিঠ ছাপিয়ে ভিজে খোলা চুলের রাশি। সদ্যস্নাত কমনীয় মুখ। নীলাভ শাড়িতে ওর ফর্সা রং সারা দেহের সহজ সৌন্দর্যটুকুকে প্রকট করে তুলেছে।

সমর খেয়ে চলেছে। ভবতারিণী বলে,

—চিংড়ির মালাইকারিটা রেঁধেছে মিনু। মাছের ঝালও।

সমর বলে—তা বুঝেছি।

—কেন? মিনতি বলে।

সমর শোনায়—নুন-ঝালের বালাই নেই। নিরামিষ রান্না তার তুলনায় অনেক ভালো।

মিনতি বলে—মেসের ঠাকুরের পাচন-সেদ্ধ খেয়ে জিবের তারই বদলে গেছে। ভালোমন্দ রুচবে কেন?

সমর বলে—অবশ্য জোটেও না। তবে খাদ্য-অখাদ্যটা চিনি।

মিনতি শোনায়—অখাদ্য কি কেউ দিব্যি দিয়ে খেতে বলেছে? খাবেন না। ওদিকে সব তো দিব্যি চেটেপুটে খাচ্ছেন।

হাসেন ভবতারিণী—থাম না মিনু!

মিনতি বলে—উনি যা-তা বলবেন আর চুপ করে থাকবো?

সমর শোনায়—তবে খেতে দিয়ে কেউ যা-তা বলে না।

মিনতি শোনায়—আমি তো অভদ্র ইতর!

ভবতারিণী বলে—চুপ কর তো মিনু! তোকে রাগাবার জন্যে বলছে আর তুই রেগে গেলি!

মিনতি চুপ করে খেয়ে উঠে গেল।

সমর তখনও তারিয়ে তারিয়ে বাগদাচিংড়ির মাথা চুষছে।

ভবতারিণী বলে—মিনু অমনিই। মাঝে মাঝে কি যে হয় ওর! বলে সে—তাহলে সোমবার বাবা চন্দনেশ্বরের পুজোটা দিয়ে আসি চলো। শুভ দিন।

সমরেরও কাজ এখানে নেই। ঘোরাঘুরিও হবে। সে বলে—তাই চলুন। সকালেই বের হবো কিন্তু।

…খাওয়াটার একটু চাপই হয়ে গেছে।

রোদপিঠ করে বসে মিনতি একটা বই পড়ছিল। এতক্ষণ কথাবার্তা বলেনি। এবার শোনায়,

—মা, তোমার অতিথির ভোজনের পর নাকি নিদ্রা দেওয়ার

অব্যেস। তা গরীবের ঘরের বিছানায় ঘুমটুম হবে কিনা শুধোও।

ওদিকের ঘরে তখন সমর উঠে পড়েছে।

বলে সে—দেখি। ঘুম হয় কিনা।

ভবতারিণী মনে মনে হাসে।

মিনতি বলে—এবার তুমি খেয়ে নাও। বেলা কম হয়নি। আবার পিত্তি পড়ে অসুখ বাধালে কে দেখবে?

ভবতারিণী বলে—খাবো এইবার।

দুপুর হয়ে গেছে। হেঁসেল গুছিয়ে ভবতারিণী নিজের সিদ্ধপক্ক নিয়ে বসেছে। সারা মনে একটা স্বপ্নের আভাস জাগে। সমরের কথা মনে হয়, দুজনে মানায় সুন্দর। ছেলেটিও চেনা-জানার মধ্যে, ভালো ছেলে। কাল ঠাকুরের কাছে গিয়ে এই প্রার্থনাই জানাবে সে।

...নিমাই সমুদ্রের ধার, বাজার, ওদিকের বাসস্ট্যাণ্ড অবধি খুঁজেছে, কোথাও সীমার কোন পাত্তাই পায়নি। মেজাজটা চড়ে গেছে। তার স্ত্রী কিনা তাকে না জানিয়েই কোথায় গেছে! এই উৎকট স্বাধীনতাকে সে প্রশ্রয় দেবে না।

...ঘরে ফিরেছে, সীমাও এসে গেছে!

তার সারা মনে তখনও আশ্রমের সেই পরিবেশটা ছবির মত ফুটে উঠেছে। তাদের সহজ মিষ্টি ব্যবহার, সেই জীবনযাত্রা সীমার মনে সাড়া এনেছে। নিমাইকে রুক্ষমূর্তি নিয়ে ঢুকতে দেখে চাইল। শুধোয় নিমাই—কোথায় যাওয়া হয়েছিল?

কথার স্বরটা কর্কশ। সীমা চাইল ওর দিকে। বলে সে,

—বেড়াতে গেছলাম।

—কোন্ চুলোয়? এখানে এসে আবার কোনো শ্লা নাগরকে খুঁজে পেলে নাকি? শুনেছি বিয়ের আগে তো অনেক নাগরই ছিল তোমার।

সীমা শান্তভাবে জবাব দেয়—ভদ্রভাবে কথা বলবে আশা করি।

নিমাই গর্জে ওঠে—ঢের দেখেছি শ্লা এমন ভদ্দর লোককে। পকেটে

ছুঁচোয় ডন মারে আর লোকদেখানি ভদ্রতা। ওসব মামদোবাজি ছুটিয়ে দোব। ফাইন্যাল ওয়ার্নিং দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ।

সীমা জবাব দিল না। দেখছে ওই তরুণটিকে। রূঢ়-কর্কশ একটি ছেলে। নিমাই বলে—এক সকালে কত রোজকার করি জানো? টোয়েন্টি থাউজেণ্ড। ওসব ভদ্রর লোকদের মাথায় ইয়ে করি! লাস্ ওয়ার্নিং দিলাম—খবরদার বেরুবে না। স্বামীর কথা না শুনলে সে স্ত্রীকে কি করে টাইট করতে হয় তা জানি।

সীমা দেখছে মদগর্বী ওই ছেলেটিকে। ওর পয়সার জোরে সে গরীব সীমাকে কিনে নিয়েছে। তার নিজস্ব সত্তা কিছুই নেই এই ঘোষণাটাই করছে নিমাই বার বার।

সীমা চুপ করে থাকে। নিমাই রেগে গিয়ে বাথরুমে ঢুকেছে, হুড়হুড় করে জল ঢালছে মাথায়। রেগে গেলে ওর মাথায় যেন আগুন জ্বলে।

...সীমা খেতেও যায় না। বলে—খিদে নেই।

নিমাই দু'একবার অনুরোধ করে ব্যর্থ হয়ে নিজেই খেতে গেছে। ভোর থেকে ধকল গেছে। তারপরও এই হুজ্জুতি। নিমাই খেয়ে এসে এবার কম্বলচাপা দিয়ে সটান ঘুমিয়ে পড়ে। নাক ডাকছে তার নিশ্চিন্ত আরামে, যেন কোন গোলমাল কিছুই হয়নি। এসব তুচ্ছ ব্যাপার তার মনে কোনরকম রেখাপাত করে না, যেটুকু করে তা নেহাত সাময়িকই।

সীমার মনে চাপা ঝড় উঠেছে। ঘর থেকে বের হয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালো। দুপুরের রোদ গেরুয়া হয়ে আসছে। ছুটির মেজাজ নিয়ে ভ্রমণার্থী ছেলেমেয়ে বউ-বাচ্চার দল কলরব করে পথে বের হয়েছে হাসিখুশি মেজাজে। ওরা সবাই আনন্দে রয়েছে। সীমার জীবন থেকে সব আনন্দ হারিয়ে গেছে। এইভাবে মুখ বুজে থাকতে হবে তাকে, বাকী জীবনটা ধরে। আজ বাঁচার বোঝাটা সীমার কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছে। বারবার মনে পড়ে বিজনের আশ্রম, স্কুল, তার কর্মযজ্ঞের কথা।

ভোগ করে সীমা, তৃপ্তি পাবার জন্য সেদিন নিমাইকে মেনে নিয়েছিল। আজ সেই ভুলটা তার জীবনকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

কাজল এমনি সাজানো গোছানো হোটেলে এর আগে আসেনি। দূর থেকে ঝাউবন-ঘেরা সুন্দর বাড়িটাকে দেখেছে, পিছনে সমুদ্রের ধার অবধি প্রাচীর-ঘেরা বাগান, সবুজ ঘাসের লনের পাশে পাশে ফুটে আছে রকমারি রঙের ডালিয়া, ক্রিসানথিমাম, বড় সাইজের গাঁদা ফুল—আরও সব গাছ। সামনে একটা ফোয়ারায় জল ছিটিয়ে পড়ছে। ওদিকে রঙ-বেরঙের গার্ডেন-আমব্রেলার নিচে রঙীন প্লাস্টিকের চেয়ার সাজানো। ওপাশের ব্যাডমিণ্টন কোর্টে উজ্জ্বল আলো জ্বেলে নিটোল-যৌবনা মহিলার দল টাইট জিন্‌স পরে ব্যাডমিণ্টন খেলছে। ওদের কলরব কানে আসে। উজ্জ্বল আলোয় শাট্‌ল-কক্‌টা শূন্যে উঠে যায়, আবার ছন্দমুখর হাতের ব্যাটের আঘাতে ও-কোর্ট থেকে শূন্যপথে এ-কোর্টে ছুটে আসে।

—খাও!

গ্লাসে ঠাণ্ডা পানীয়। কাজল একটা গার্ডেন-আমব্রেলার নিচে ওদের সঙ্গে বসে কোল্ডড্রিংক্স খাচ্ছে।

…বাদল রায় আজ ছুটি পেয়েছে।

দুপুরের দিকে গাড়ি এসেছিল কলকাতা থেকে। তার সেই বিপুল শরীরটির কাছে দীঘার কোন আকর্ষণই ছিল না, পায়ে হেঁটে ঘোরা তার কাছে অপমানজনক, আর ছোট জায়গায় ক্লাব, মহিলা সমিতি নেই। লতিকার 'বোর' লাগছিল। ওদের ক্লাবের কি অনুষ্ঠান আছে, তাই দুপুরেই কলকাতা চলে গেছে সে। বাদল দু'তিনটে দিন এখানে রেস্ট নিয়ে ফিরে যাবে। বলে-কয়ে স্ত্রীর কাছে ছুটি নিয়েছে।

…আজ তার কোন বাঁধন নেই।

তাই রমেনও মুখিয়ে ছিল। বৌদিকে 'সী অফ' করে সন্ধ্যার পর কাজলকে নিয়ে বেড়াতে এসেছে এদিকে। কাজলও চাকরির আশা নিয়েই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হতে এসেছে।

রমেন বলে—দাদা বলছেন, খাও! লজ্জা কি? আরে, দাদার কাছে আবার লজ্জা!

কাজল এই পরিবেশে একটু হকচকিয়ে গেছে।

আশপাশে অনেকেই অমনি রঙীন ছাতার তলে বসে মেয়ে-পুরুষে বিলাতী মদ খাচ্ছে। হাসিঠাট্টাও চলেছে। মেয়েদের শাড়ি-বেশবাসের বাঁধনটা এখানে অনেক আলগা।

বাদল রায় দেখছে কাজলকে।

ওই ধরনের সলজ্জ মেয়েরা সহজে হাতে আসতে চায় না। ওদের টাকাপয়সা সামাজিক পরিচয় তেমন নেই। তাই দৈহিক সম্ভ্রমটাই ওদের কাছে সবথেকে বড় হয়ে থাকে। এ যেন তুচ্ছ একটা কুসংস্কার মাত্র।

বাদল রায় তবু সাবধানে এগোতে চায়। বাদল রায় বলে,

—না, না। ভয়ের কিছুই নেই। আমি একটু ড্রিঙ্ক করি, তাও সামান্যই, জাস্ট ফর হেল্‌থ। রমেন ব্যাটা তাও খায় না। তাই তোমাদের কোল্ডড্রিঙ্কস্‌ দিতে বলেছি। নির্দোষ পানীয়।

কাজলও তা জানে। বলে সে—না, না। খাচ্ছি তো।

বাদল রায় বলে—চাকরির চেষ্টা করছি, কাজল। রমেন এত করে ধরেছে। তবে কি জানো, বাজার দারুণ খারাপ। কিছু করতে যাবো ইউনিয়ন চেপে ধরবে। কারখানা যেন আমার নয়, তাদেরই।

রমেন বলে—ও-নিয়ে ভাববেন না দাদা, ইউনিয়নকে আমি সামলাবো। তাদেরও বলে-কয়েই রেখেছি।

বাদল রায় বলে—দেখো বাপু, শেষকালে যেন গোলমাল না হয়

...রাত্রি নামছে।

শান্ত জায়গা। সন্ধ্যার পর রাত্রিটা এখানে চট্‌ করে ঘনিয়ে আসে। বালুচর ফাঁকা হয়ে যায়, ঝাউবনে আঁধার নামে। বাঁধের উপর সামনের দোকানপসারে কিছু উৎসাহী যাত্রীরা কিছুক্ষণ থেকে যে যার আস্তানায় ফিরে যায়। রাত্রির অন্ধকারে সমুদ্রের বুকে মাছধরা নৌকা-বহর, লঞ্চের ঘাটে দু'চারটে মিটিমিটি আলো জ্বলে মাত্র।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় সমুদ্রের কলগর্জন মুখর হয়ে ওঠে। জনকলরব নেই। একা জেগে থাকে ওই সমুদ্রই। তার শ্রান্তিক্লান্তি নেই—বরং রাতের অন্ধকার নির্জনে তার মত্ততা যেন বেড়ে ওঠে।

কাজল বলে—রাত্রি হয়েছে।

বাদল রায় এতক্ষণে দু-তিন পেগ হুইস্কি শেষ করেছে। মুখ বুজে বসে আছে রমেন। তার মদ-খাওয়াটা ঠিক হবে না। কাজল জানতে পারলে ঘুঁটি কেঁচে যাবে। রমেন মাল খাবে কাল, কালই সে কাজল-বাদলরায়ের ব্যাপারটাকে ফাইন্যাল করতে চেষ্টা করবে। নগদ হাজার আষ্টেক-দশ টাকা মোচড় দিয়ে হাতাতে পারবে সে। কাজল বুঝবে তারপর।

...রমেন বলে—চলো। হোটেলে খেয়ে ফিরতে হবে। তাহলে চলি, দাদা। কাল সকালে দেখা হবে।

বাদল রায়ের খেয়াল হয়। বলে সে—আরে, বাইরে কেন খাবে? চলো—এখানেই খেয়ে যাবে কাজল।

কাজল ভদ্রলোকের কথায় একটু খুশিই হয় মনে মনে।

প্রথম থেকে ওই ভদ্রলোক ভালো ব্যবহারই করেছে তার সঙ্গে। এতবড় ব্যবসায়ী, এত টাকার মালিক অথচ বেশ সহজই। মদ ওঁরা এক-আধটু সকলেই খান। এখানের পরিবেশে এসে কাজলও দেখেছে সেটা। বরং মদ গিলে এখানে ওখানে দু-একজন বেসামাল হয়ে বেলাল্লাপানা করছে, উনি আদৌ তা করেননি। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষই রয়েছেন। খেতেও বলেছেন তাদের।

কাজল চাইল রমেনের দিকে।

রমেন বলে—চলো, দাদা বলছেন। এদের ফুড-ও টেস্ট করা হবে। তা দাদা, হোটেলটা ভালোই করেছে।

ডাইনিংরুমটা সাজানো। দেওয়াল জোড়া কাঁচ বসানো। কোথাও বিরাট বিচিত্র রঙের ফ্রেস্কো। হল্‌টায় টেবিল চেয়ার সাজানো। হাল্‌কা বিদেশী সুর ওঠে, বাতাসে ওঠে সুগন্ধি রান্নার মৃদু খোস্‌বু। ইচ্ছে করেই আলোটাকে মৃদু করে রাখা হয়েছে।

কাজল ওদিকের টেবিলে বসেছে।

রমেন বাদল রায়ের সঙ্গে এদিকে এসে কি কথা বলছে।

...দীপকবাবু দীঘার তরুণ পুলিশ অফিসার। এখানে ক'বছব এসেছেন। বিচিত্র এই সমুদ্রতীরের প্রমোদকেন্দ্রে বহু বিচিত্র মানুষেব ভিড় জমে। মাঝে মাঝে চুরি চামারিও হয়, কিছু ক্রিমিন্যালও এসে পড়ে। সমুদ্রেও স্নানের সময় দু-চারটে দুর্ঘটনা ঘটে যায়, সেগুলো নেহাৎ দুর্ঘটনাই এছাড়াও ঘটে দু-চারটে বিচিত্র ব্যাপার। দূরদূরান্ত থেকে বাধামুক্ত মন নিয়ে ছেলেমেয়ে, প্রেমিক-প্রেমিকারাও আসে। কেউ অভিভাবকদের না জানিয়েও চলে আসে। তারপর দু-একটা সুইসাইড কেস্‌ও ঘটে, কি মান-অভিমানের পালায় এমনি বিয়োগান্ত নাটকও ঘটে যায়। তার ঠ্যাপা সামলাতে হয় পুলিশকেও।

দীপকবাবুর নজব তাই সব দিকেই। আব দামী হোটেলেও আসেন অনেক বিচিত্র পেশার মানুষ। দীপকবাবু অনেক সময় ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ভ্রমণার্থীব বেশেই ঘোবেন। এতে সুবিধা হয়।

হোটেলের ম্যানেজাব আব কর্মীরা অবশ্য দীপকবাবুকে চেনেন আপ্যায়নের চেষ্টাও করেন। কিন্তু দীপকবাবু ওদিকটা এড়িয়ে গিয়ে বলেন—মাঝে মাঝে আপনাদের রেস্তোঁরায় 'চাইনীজ' খেতে আসি। যদি না দেন, আসবো না।

বিলটা নিজেই পেমেণ্ট করেন।

ম্যানেজার সামনে কিছু বলতে পাবে না। আড়ালে স্টাফদের বলে—ওর উপর নজর রাখবি। কড়া লোক।

দীপক এক কোণে বসে খাচ্ছে। ওর চোখে পড়ে কাজলেব টেবিলটা। এই ঝকঝকে পালিশ-করা সুবেশী মহলের ভিড়ে সাধারণ শাড়ি পরা সাধারণ একটি মেয়েকে দেখে অবাক হয়েছে সে। এই ধরনের জায়গায় আসতে অভ্যস্ত নয় সে। যেন আনা হয়েছে ওকে।

দীপক নজর রাখে ওদিকে।

...বাদল রায় ওদিকে করিডরে দাঁড়িয়ে কি বলছে রমেনকে।

রমেন এখনও পুরো টাকা পায়নি। সুতরাং মাল ডেলিভারি দিতে

চায় না। কাল পুরো টাকা পেলে ও-কাজ সমাধা করবে। রমেন বলে,

—একটু সাবধানে এগোতে হবে, দাদা। মাছ চারে তো এসেছে—টোপও গিলবে। এত হুড়বড় করছেন কেন? একটু টাইম দ্যান। কালই হয়ে যাবে।

অগত্যা বাদল রায় বলে—ঠিক আছে। কাল যেন কথার খেলাপ না হয়। তোর টাকাও দিয়ে দেবো।

রমেন বলে—শিওর! চলুন। খাবার দিচ্ছে টেবিলে।

বাদল রায় এখন পরম অতিথিপরায়ণ সজ্জন!

প্লেটে সুন্দর করে সাজানো স্যালাড এসেছে। গাজরের ফুল বানানো। কাজল সাজানোর বাহার দেখছে। সুন্দর প্লেটে খোস্‌বুদার ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন এসেছে। শেষ পাতে টুটি-ফুটি। রকমারি ফলের টুকরো—ঘন আইসক্রিম মেশানো হিম-হিম স্বাদ।

বাদল রায় বলে—লজ্জা কোরোনা কাজল, খাও আরামসে। কাজল এত সুখাদ্য এমন পরিবেশে খায়নি। মনে মনে সে কৃতজ্ঞ বোধ করে।

দীপক চৌধুরী দেখছে ওদের নিস্পৃহভাবে।

দাঘার পথ জনহীন হয়ে আসছে, পথের ধারের দোকানীরা ঝাঁপ বন্ধ করেছে, লোকজনও কম। বাসের আনাগোনা বন্ধ। কাজল আর রমেন ফিরছে খুশিমনে। কাজল বলে,

-সত্যি ভদ্রলোক পারফেক্ট জেণ্টেলম্যান। বললেন তো চেষ্টা করবো।

রমেন বলে -দাদা যখন কথা দিয়েছে ঠিক হয়ে যাবে। যে-ক'দিন আছেন এখানে একটু যোগাযোগ রাখতে হবে. মানে কি জানো? ইংরাজীতে কি যে বলে—গ্লা—হ্যাঁ, আউট অব মাইণ্ড—আউট অব সাইট।

কাজল হাসছে রমেনের ইংরাজী শুনে। বলে সে,

—ধ্যাৎ রমেনদা, ওটা হবে আউট অব সাইট আউট অব মাইণ্ড।

রমেন সিগ্রেটে টান দিয়ে বলে—ওই একই কথা। তাই বলছিলাম,

একটু নরম হয়েছে—এখন কলে কৌশলে চাকরিটা হাতিয়ে নাও। বুঝলে ?

ওরা বড়রাস্তা ছেড়ে ডানহাতে গ্রামবসতের দিকে তাদের হোটেলের পানে চলেছে। ওরা দুজনে নিজেদের স্বপ্নে মশগুল। খেয়াল করেনি পিছনে একটি ভদ্রলোকও আসছে।

হোটেলে এসে ঢুকলো ওরা দুজনে।

দীপক চৌধুরীও দূরে থমকে দাঁড়িয়েছে পথচারীর মত। একবার নজর বুলিয়ে ওদের ভিতরে চলে যেতে দেখে, এবার ফিরে চলেছে সে থানার দিকে।

…সীমা বৈকালেও বের হয়নি।

টুরিস্ট লজের তেতলার ব্যালকনিতে বসে চেয়ে থাকে আনন্দ-কোলাহলমুখর জনতার দিকে। বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে।

ঘুম ভাঙে নিমাইয়ের।

—চা খাবে ? সীমা নেহাত ভদ্রতা করেই শুধোয়। তারও বৈকালে চা খাওয়া হয়নি। নিমাই বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে বলে,

—চা ! এসময় চা খায় নাকি ? বেয়ারাকে কিছু গরম পকৌড়া আনতে বলো।

উঠে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নিমাই এবার দেরাজ খুলে মদের বোতল, গ্লাস বের ক'রে হুকুম করে—ওখানে কাজুর প্যাকেট আছে দাও, আর জলের জগটা।

সীমা ওকে বোতল বের করতে দেখে চেয়ে থাকে ঘৃণাভরে।

ওই অভ্যাসটা নিমাইয়ের আছে কিন্তু এতদিন বাইরে গিলে আসতো। ইদানিং ঘরেও চালায়। আর সেই মাতালের খিদমৎ করতে হয় সীমাকে কেনা বাঁদীর মত।

নিমাই মদটা গ্লাসে ঢেলে চড়াস্বরে বলে—কথা কানে গেল ? জলের জগ আর কাজুবাদাম দিতে বললাম না ?

সীমা আর মদের রসদ যোগাতে পারবে না। তার মনের পুঞ্জীভূত

বিক্ষোভ এবার দানা বেঁধেছে। বলে সে—ওইতো রয়েছে টেবিলে, নিয়ে নাও। আমি দিতে পারবো না।

নিমাই ওর চড়াস্বরে একটু থমকে গেছে। কঠিন প্রতিবাদের মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সীমা।

—ঠিক আছে। নিমাই নিজে উঠেই নিল ওসব।

এক চুমুকে বেশ খানিকটা তাজা হুইস্কি পেটে পড়তে এবার তেজীয়ান হয়ে ওঠে সে। ক্রমশ নিমাই তার হারানো নিষ্ঠুরতাকে খুঁজে পাচ্ছে। কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠেছে সে। নিমাই হুকুম করে এবার সীমাকে,

—শোনো। মদ ঢেলে দাও গ্লাসে।

সীমা এবার ফেটে পড়ে--লজ্জা করে না তোমার, ঘরের বউকে মদ ঢেলে দিতে বলতে?

নিমাই এখন বীরপুরুষ! কঠিন স্বরে গজায় সে,

—ঘরের বউ। শ্লা কত নাগরের সঙ্গে পীরিত করে এখন লজ্জাবতী লতা সাজা হচ্ছে! জানিনা কিছু?

সীমা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

নিমাই গর্জন করে—যা বললাম করো।

—না। এসব করতে হয় বাজারের মেয়েদের কাছে যেও—সে অভ্যাস তো আছে। আমি পারবো না।

—কি বল্‌লি! আবার জবাব! নিমাই ঘোষকে চিনিসনা!! সতীপনা। লাফ দিয়ে উঠেছে নিমাই। এর আগে পুরা বোতলই শেষ করে টলছে, দু'চোখ লাল। হিংস্র মাতাল লোকটা হাতের গ্লাসটাই ছুঁড়ে দেয় সীমার দিকে।

গ্লাসটা এসে সজোরে লেগেছে সীমার কপালে, ভেঙে যায় চুর চুর হয়ে। কাঁচের টুকরোতে সীমার কপালটা গভীরভাবে কেটে গেছে, ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় মুখটা। রক্ত ঝরছে। সারা দেহে মদের বিশ্রী গন্ধ, জামাকাপড়ও মদে ভিজে গেছে। সীমার রক্তঝরা দেখে নিমাই যেন ক্ষেপে উঠেছে।

চীৎকার করে সে—খুন করেঙ্গা!

সীমা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে ভাবতে পারেনি ওই মাতাল জানোয়ারটা এই অবস্থার পরও তার গায়ে হাত তুলবে! চড়-চাপড় পড়ছে—সীমার যেন চেতনা নেই। গর্জাচ্ছে নিমাই।

হঠাৎ দরজাটা খুলে পাশের ফ্ল্যাটের একটি ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী, এদিকের ফ্ল্যাটেরও দু-একজন এসে পড়ে। মদের বোতল গড়াচ্ছে, ভাঙা গ্লাসের টুকরো, সীমার ওই রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত মুখ আর নিমাইয়ের মারমূর্তি দেখে তারাই বাধা দেয়।

—রাতের বেলায় মদ গিলে এভাবে ভদ্রমহিলাকে মারবেন?

নিমাই গর্জায় জড়িত কণ্ঠে—নিজের মাগকে আলবৎ মারবো, আপনাদের কি মশাই? শা—লা—

টলতে টলতে নিমাই খাটের উপর লুটিয়ে পড়ে। ওঠার শক্তি নেই, মদের নেশাটা এবার পুরোপুরি পেয়ে বসেছে তাকে। বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকে বিছানায় ঘাড় মুখ গুঁজে নিমাই।

বিড়বিড় করছে—আমার মাগ্‌কে শাসন করবো আমি। কোন্ শ্লার কি!

সীমা লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে কাঠের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। তার সব সম্মান শালীনতা সম্ভ্রম আজ পথের ধুলোয় মিশিয়ে গেছে।

ওরা চলে গেছে।

খাটে পড়ে আছে নিমাইয়ের মত্তপ বেবশ দেহটা, ঝুলছে খানিকটা।

সীমা ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালো। সামনে উর্মিমুখর অশান্ত সমুদ্র। সীমার চোখে জল নামে। অঝোর কান্নায় সে ভেঙে পড়ে।

আজ এই হীন জঘন্য জীবনকে সে মেনে নিতে পারবে না। তার পথ নিজেকেই দেখে নিতে হবে।

বমি করছে মত্তপ জানোয়ারটা।

বিশ্রী দুর্গন্ধে ঘর ভরে গেছে। সীমার জীবনে ওই ক্লেদ-নোংরা অসহ্য হয়ে উঠেছে।

…ভোর হবার আগেই আবার উঠেছে নিমাই।

মাথাটা ভারি, মুখে চোখে জল দিয়ে চাইল। সীমা সারা রাত শোয়নি বিছানায়। এককোণে একটা সোফায় বসে রাত কাটিয়েছে। মুখে কপালে রক্ত তখনও জমে আছে। বেদনা করছে সেই ক্ষতগুলো।

ঘরময় কাঁচ ভাঙা বোতল ছড়ানো। বমি থিক্‌থিক্ করছে। যেন একটা নরককুণ্ড।

নিমাইকে টাকার ধান্দায় বের হতে হবে।

প্যাণ্ট জামা পরে ব্যাগে টাকার বাণ্ডিল নিয়ে নিমাই বলে,

—আমি মাছের বাজারে যাচ্ছি।

সীমা স্থাণুর মত বসে আছে। কোন জবাবই দিলনা ওর কথার।

নিমাই জানে আজ হাজার পনেরো-কুড়ি টাকা আমদানী করতে পারবে সে। টাকার স্বপ্ন নিয়েই বের হয়ে গেল সে।

তখন দীঘার ঘুম সবে ভাঙছে। ঝাউবনে ঘুমভাঙা পাখিদের কলরব ওঠে। পুব সমুদ্রের আকাশে শেষ তারা ডুবে গিয়ে সূর্য-ওঠার প্রতিশ্রুতি রেখে গেল।

সীমা জবাবও দিল না নিমাইয়ের কথার, ফিরেও চাইল না। সারা ঘরে তখনও দুর্গন্ধ ভরে আছে। সীমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। দরজা খুলে অন্ধকার আকাশের নীচের ব্যালকনিতে দাঁড়ালো সে।

হরিপদ সরকারের ভোরে ওঠা অভ্যাস, শীতের হাওয়ায় কম্বলের তাপে আজ নোতুন করে সে মণিমালার দেহমনের উত্তাপকে খুঁজে পেয়ে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে আছে।

মণিমালার ডাকে চাইল—অ্যাই উঠবে না ?

সরকারমশাই দেখছে মণিমালাকে। ওর দেহের সঙ্গে নিজের দেহটাকে সঁপে দিয়ে হরিপদ সরকার বলে,

—উঠুম। এত ভোরে উইঠা আর বাজারে যাইবার লাগবোনা নতুনবউ। ছুটিই লই দিনকয়েক। অনেক খাটছি পরের জন্যে।

হাসে মণিমালা।

আজ সেও এমনি করেই মানুষটাকে নিকট করে তৃপ্ত হয়েছে। তার ব্যক্তিত্ব, রূপে ভালবাসায় সে আজ ওকে কাছে এনেছে, মনে হয় দীঘার এই শ্যাম ঝাউবন, সমুদ্রবেলার কি মাদকতা আছে!

মণিমালাও নিজেকে লোকটার নিবিড় বাঁধনে ধরা দিয়ে খুশি হয়েছে।

ভবতারিণী ভোরেই উঠেছে। আজ তারা যাবে চন্দনেশ্বর শিবের পুজো দিতে। মিনতি ছুটির মুডে রয়েছে। শীতের ভোরে কম্বলটা ভালো করে জড়িয়ে চোখ বোজার চেষ্টা করে।

মায়ের ডাকে চাইল। ভবতারিণী তাড়া দেয়,

—অ মিনু, ওঠ! চা-টা খেয়ে তৈরি হয়ে নে। বাবার পুজো দিতে যাবো।

মিনু কম্বলটা জড়িয়ে বলে,

—তাই রাতভোর ঘুম নেই দেখছি। এত ভোরে উঠে কি হবে? আর তোমার ছড়িদারও তো আসেনি। সেই সমরবাবু।

ভবতারিণী ভাবিত হয়। তবু বলে,

—এসে পড়বে। বললে সকালেই আসবো।

মিনতি শোনায়—ভ্যাখোগে গুল মেরে দিয়েছে।

ভবতারিণী বলে—না রে। তেমন ছেলেই নয়, দায়িত্বজ্ঞান আছে তার। তুই ওঠ তো। দেরী হলে বরং একটু দেখে আয়। কোথায় উঠেছে সমর জানিস তো?

মিনতি এর আগেও গেছে ওর আস্তানায়। সে খবরটা মাকে জানতে দিতে চায় না। বরং বিরক্তিভরে না-জানার ভান করে বলে,

—কে কোথায় থাকে আমি জানবো কি করে? চেনা-জানা নেই—হুট করে পরকে এত আপন ভাবতে পারিনা বাপু!

ভবতারিণী বলে—চেনা-জানা নেই কিরে? ওর মা আমার ছেলেবেলার বন্ধু ছিল। ওকে এইটুন দেখেছি। ওর সাত গুষ্টিকে চিনি।

হঠাৎ দরজার কড়াটা নড়ে ওঠে।

ভবতারিণী কথা বন্ধ করে দরজা খুলে সমরকে দেখে বলে,

—এসো বাবা !

এরপর তার কথার সত্যতা প্রকাশ করার জন্যই বলে ভবতারিণী,

—দ্যাখ মিনু, বলিনি সমরের দায়িত্বজ্ঞান আছে। বলেছে যখন—আসবেই। তোর এখনও বিছানা ছেড়ে ওঠাই হ'ল না।

ভবতারিণী সমরকে বলে—তুমি বোসো বাবা। চা করে আনি। সকাল সকাল না বেরুলে ফিরতে দেরী হয়ে যাবে।

ভবতারিণী বের হয়ে গেল।

সমর একটা চেয়ারে বসেছে, মিনতি বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে একটু লজ্জা বোধ করে। কাপড়চোপড় অগোছালো হয়ে আছে, জামাটাও খোলা। মিনতি চাইল সমরের দিকে।

বাইরে থেকে ভবতারিণী তাড়া দেয়—উঠে তৈরি হয়ে নে মিনু !

মিনতি সমরকে চাপা স্বরে বলে—অ্যাই। একটু বাইরে যাও না !

সমর ঠিক ব্যাপারটা বোঝে না। শুধোয়—কেন ?

মিনতি ওর নিষ্পাপ চাহনি আর ওই জবাবে একটু বিচিত্র হাসি হেসে বলে—জানি না ! যেতে বলছি, যাও। কিছুই বোঝোনা মেয়েদের ব্যাপার ?

সমর এবার ব্যাপারটা বুঝে বাইরের বারান্দায় এল।

মিনতি উঠে পড়ে। এবার বের হবার জন্য তৈরি হচ্ছে সে।

...বাংলার শেষ সীমান্তে দীঘার জনপদ। সেদিনের ছোট্ট জনপদ ক্রমশ আয়তনে বাড়ছে। সমুদ্রের ধার বরাবর বাংলার সীমান্তের দিকে এতদিন পড়ে ছিল বালিয়াড়ি আর ঝাউবন। সেই বালিয়াড়ির উপর গড়ে উঠছে হাসপাতাল, নোতুন কলোনী, রেস্টহাউস, হলিডে হোম ডানদিকে সেই নোতুন দীঘা, বাঁ-হাতে সমুদ্রের বাঁধ, ঝাউবন—মাঝ দিয়ে পিচঢালা পথটা গেছে সামনে উড়িষ্যার সীমান্ত অবধি।

বাস-রিক্সা ওই অবধি আসে, তারপরই চেকপোস্ট, ওদিকে উড়িষ্যার ছোট্ট গ্রাম। হাটতলাও আছে, আছে কোন হোমিওপ্যাথিক ধন্বন্তরির

চিকিৎসালয়, চা-পানের দোকান। তারপরই ঘন কাজুবাদাম, আম-কাঁঠালের ছায়াঘন আলপথ। দু'দিকে উর্বর ধান-জমি। কোথাও বালুর স্তূপ জুড়ে বিরাট কেওড়াবনের দুর্ভেদ্য আবেষ্টনী।

উড়িষ্যার সীমান্ত অবধি রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা আছে, কাজও শুরু হয়েছে। কিন্তু কোন আইনের জটিলতায় সেই পথ এখনও সীমান্ত অবধি এগোতে পারেনি। খানিকটা এসে থেমে গেছে।

সমর সকালের বাসে ভবতারিণী, মিনতিকে নিয়ে সীমান্ত অবধি বাসে এসে বাকী পথ হাঁটতে শুরু করেছে।

সকালের সোনাহলুদ রোদ সজল স্নিগ্ধ গ্রামের বুকে সোনালী ধানক্ষেতে লুটিয়ে পড়েছে। নারকেলগাছের পাতায় সমুদ্রের বাতাস হানা দেয়।

গ্রামের স্নিগ্ধ শিশিরভেজা রূপ দেখে মিনতি মুগ্ধ। কলকাতার ইটকাঠের পরিবেশে এই সবুজ স্নিগ্ধতার কল্পনা করা যায় না। পাখি ডাকছে।

ভবতারিণী বলে—আমাদের গ্রামের কথা মনে পড়ে সমর। এমনি সুন্দর সকালে পাড়া বেড়াতে বের হতাম। ঘাসে ঘাসে শিশিরের ছোঁয়া রোদে জ্বলজ্বল করতো। ধানকাটার সময়, বাতাসে খেজুররসের সুবাস!

সমরও গ্রামে মানুষ। তার চোখের সামনে এই চেনা ছবিটা ভেসে ওঠে।

মিনতি বাধা দেয়—থামো তো! হাঁটতে হাঁটতে পা-ব্যথা হয়ে গেল। কতদূর আর সেই শিবমন্দির?

যাত্রীদের অভাব নেই।

মেদিনীপুর-তমলুকের দিক থেকেও আসে পুজো দিতে গ্রামের লোকজন। তাদেরই একজন বলে—এই তো এসে গেলাম গো!

...ওরা এসে ওঠে গ্রামের আলপথ ছাড়িয়ে একটু পিচের রং লাগানো পথে।

মিনতি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে—ওমা! পাকা রাস্তা যে।

সমর বলে—এই রাস্তাটা বাংলার বর্ডার অবধি যাচ্ছে। কি ব্যাপারে

কাজ বন্ধ হয়ে আছে। এ পথ হয়ে গেলে, দীঘা থেকে রিক্সায় আসা যাবে সিধে মন্দির অবধি।

ছোট্ট গ্রামের চিহ্ন ছড়ানো দু'পাশে। একটু এসে দেখা যায় পাকা দোতলা স্কুলবাড়ি।

তারপরই বিরাট হাটতলার চালা উঠেছে সারবন্দী, ওপাশে একটা অস্থায়ী চালার সিনেমা-হলে কোন ওড়িয়া ছবির বিজ্ঞাপন দেখা যায়।

জায়গাটায় তীর্থযাত্রীর ভিড় হয়। সারবন্দী পাণ্ডাদের বসতবাড়ি, যাত্রীনিবাস, দোকানপত্র রয়েছে। কোন্ পাণ্ডার কোন্ বংশের কে, তার সাইনবোর্ডও রয়েছে যাতে যাত্রীরা ভুল করে একজনের হাত ছাড়িয়ে অন্যত্র না উঠে পড়ে।

ছোট জায়গাটা কিন্তু বেশ জমাটই। উৎসবের সময় অনেক যাত্রী আসে জাগ্রত দেবতাকে পুজো দিতে। এখান থেকে বালেশ্বর শহরে যাবার বাসও রয়েছে।

মাঝপথে পড়ে সুবর্ণরেখা নদী। শীতের ক'মাস তার উপর অস্থায়ী সেতু বানিয়ে যাতায়াত চলে। বর্ষার সময় এ পথ বন্ধ। গাড়ি আর চলে না। তখন এদের বেশি যাতায়াত চলে দীঘা হয়ে। এখনও এদের হাটগঞ্জ বলতে দীঘা, না-হয় রামনগর।

ছোট জনপদ শুধু এই দেবতার মন্দিরকে কেন্দ্র করেই প্রধানত টিঁকে আছে।

মিনতি বলে—সুন্দর মন্দির!

ভবতারিণী দু'হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে বলে,

—হবে না? বাবা খুব জাগ্রত রে!

পাঁচীলঘেরা অনেকটা জায়গায় কয়েকটা মন্দির। একদিকে উড়িষ্যার গঠনশৈলী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শ্রীজগন্নাথমন্দির। অন্যদিকে সুউচ্চ মন্দিরশীর্ষে বিরাট আমলক। ওইটি চন্দনেশ্বরদেবের মন্দির, সামনে বিশাল নাটমন্দির। ওপাশে একটা পুষ্করিণী। জায়গাটা বড় বড় অশত্থ-বটগাছের ছায়া-ঘেরা।

ভবতারিণী শুদ্ধচিত্তে পুজো নিবেদন করছে, মন্দিরে অপ্‌রূপী দেবতা। শিব পঞ্চরূপে বিরাজমান। ক্ষিতি-অপ্‌-তেজ-মরুৎ-ব্যোম।

সমর বলে—জম্বুকেশ্বরের শিবমন্দিরে লিঙ্গের চারপাশে সর্বদাই জল উঠছে। জ্বালামুখীতে মহাদেবকে কল্পনা করা হয়েছে তেজ রূপে। আগুন জ্বলে সর্বদাই সেখানে। চন্দনেশ্বর-মন্দিরেও তেমনি লিঙ্গের চারপাশে দেখা যায় জল—মাটির নীচে থেকে উঠছে সেই জল।

…মন্দিরে ঘণ্টা বাজে।

তার শব্দ ঝাউবনের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। ভবতারিণী নাটমন্দিরে বসে ধ্যান সারছে।

রোদ-পিঠ করে এদিকে দাঁড়িয়ে আছে সমর, মিনতি।

মিনতি স্নান সেরে এসেছে, পিঠ ছাপিয়ে পড়েছে একরাশ চুল।

সমর বলে—দেবতাকে কি প্রার্থনা জানিয়ে প্রণাম করলে?

মিনতি চাইল ওর দিকে। মুখে ওর দুষ্টুমির হাসি। বলে সে, —আমার চাওয়ার মধ্যে সিলেকশন গ্রেডের প্রমোশন। তাই চাইলাম। আর তুমি?

সমর বলে উদাস স্বরে—আমার চাওয়ার কিছুই নেই, তাই চাইনি। ঢিপ ঢিপ করে পেন্নাম করে উঠে এসেছি।

—তাই নাকি! মিনতি ব্যঙ্গের স্বরেই বলে কথাটা—তাহলে সব পাওয়ার সাধ মিটে গেছে? মুক্তপুরুষ দেখছি!

সমর বলে—সেটা ক'দিনে নিশ্চয়ই বুঝেছো।

মিনতি চাইল। চোখেমুখে ওর দুষ্টুমির আভা। বলে সে,

—বাইরে থেকে বোঝা যায়না সবকিছু। অনেকে আবার অভিনয়ও করে কিনা।

মিনতির কথার জবাব দিতে যাবে সমর—ভবতারিণীর ডাকে চাইল।

ভবতারিণী এগিয়ে আসে—তোরা দুজনে এখানে?

মিনতি শোনায়—কেন? দেখতে পাওনি?

ভবতারিণী বলে—আমি খুঁজছি ওদিকে। বাবাকে পুজো দিয়ে মনটা শান্ত হ'ল বাছা। খুব তৃপ্তি পেলাম।

মিনতি বলে—রোদ বাড়ছে। এবার ফিরবে তো ? এতখানি পথ!

ভবতারিণী বলে—ও চলে যাবো।

ওরা ফিরছে। ভবতারিণী এবার দাঁড়ায়।

বালিয়াড়িতে নরম বেতের তৈরি ঝুড়ি, ঝিনুকের কি-সব, পুজোর শঙ্খ—টুকিটাকি কিনতে থাকে। মিনতি বিরক্ত হয়ে বলে,

—শুরু হল এবার সংসারধর্ম!

ভবতারিণী সালিশী মানে সমরকে—বলো তো বাবা, এসব লাগেনা ? সংসারের মস্মো কি বুঝলি ? হোক নিজেদের সংসার তখন বুঝবি।

সমর চাইল মিনতির দিকে। সমরের হাতে সেই ঝুড়ি, জিনিসপত্র। মিনতি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে—আর সং সেজে কাজ নেই। এখন চলো তো। উঃ, কত বেলা হয়ে গেল।

...তুপুরের দিক থেকেই আকাশে মেঘ জমছে। শীতকাল। এ-সময় মেঘ সহসা জমে না। আবহাওয়া শান্ত থাকে। কিন্তু সমুদ্রতীরের আবহাওয়ার মেজাজ-মর্জি স্বতন্ত্র। এই আছে বেশ ঝকমকে হাসিখুশি, হঠাৎ বদলাতে শুরু করলো।

আকাশের বুকে জমছে কালো মেঘগুলো। সমুদ্রও ক্রমশ ফুঁসে উঠছে। নীল জলের বুকে কালো মেঘের ছায়া নেমেছে। সমুদ্রের ধারে জেলে-বসত নৌকা-বসতের মানুষগুলোর চোখে উদ্বেগের ছায়া নামে। সমুদ্রের ধারের গ্রামের অনেক মানুষ সমুদ্রে গেছে। তাদের বাড়ির লোকও কালো আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। প্রার্থনা করে, ওদের ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরিয়ে দাও ঠাকুর!

...দীঘায় কয়েকদিনের জন্যে চেঞ্জে আসা বাবুদের কাছে এই ঝড়ের সংকেত অন্যরূপে দেখা দেয়।

বীচে লোকজনের কলরব ভিড় একটু থমকে গেছে। গায়ে চাদর কোট শাল চাপিয়ে কিছু ভ্রমণকারী বাঁধে বসে রয়েছে।

রমেনও বের হয়েছিল কাজলকে নিয়ে। মেঘ দেখে কাজল তার ছোট্ট ছাতাটা নিয়েছে। স্টীলের বাঁটের বেঁটে ছাতা। রমেন বলে,

—ঝোড়ো হাওয়াই চলছে। বৃষ্টি হবেনা বোধ হয়। আর হলে, যা ঝড় তাতে ছাতা কাজে লাগবে না।

কাজলের ভালো লাগে এই ঝোড়ো আবহাওয়া। বিস্তীর্ণ আকাশ, সমুদ্রে যেন কি প্রস্তুতি চলেছে। সমস্ত নৌকার বহর সামনের সমুদ্র থেকে ওদিকের খাঁড়ির ভিতর চলে যাচ্ছে।

সমুদ্রতীরও জনহীন হয়ে আসছে।

কাজল বলে—চলো ফেরা যাক। যা ঠাণ্ডা!

রমেনের প্ল্যানটা ছিল অন্যরকম। আজ বাদল রায়ের কাছে তার টাকা পাবার কথা। কালই ফিরতে হবে তাকে।

রমেন বলে—ঠাণ্ডা লাগছে? চলো সামনের হোটেলে গিয়ে একটু কফি খেয়ে ফিরবো।

…বাদল রায় রমেনের পথ চেয়েই ছিল।

বৈকাল থেকেই যেন আধার নেমেছে। বাদল রায়ের হাতেও কোন কাজ নেই। আজ রমেন মেয়েটাকে তার হাতে তুলে দেবে। বাদল রায় এসব কাজের আগে নিজেকে একটু তৈরি করে নেয়। সাদা চোখে এগুলো করা যায় না। তাই আগে থেকেই বিবেকটাকে অ্যালকোহলের জারকে জারিয়ে নেবার জন্যই বৈকাল থেকে মদ নিয়ে বসেছে।

রমেনকে ঢুকতে দেখে চাইল সে। বাদল রায় শুধোয়,

—এত দেরি?

রমেন বলে—দেরি কোথায়? সবে তো সন্ধ্যা। মাল হাজির। রেস্তোরাঁয় বসিয়ে রেখেছি। তাহলে আমার মালকড়িটা?

বাদল রায় ড্রয়ার থেকে টাকার বাণ্ডিলটা দিয়ে বলে—দেখে নে। তাহলে নিয়ে আয় এখানে।

রমেন বলে—আনছি। তবে গোলমাল যেন না হয় বাপু। আর

ওর চাকরীর ব্যাপারটা যো-সো করে সামাল দিয়ো দাদা। ওসব তালিবালি না করলে জালেই আসতো না মেয়েটা।

বাদল রায় জানে সে-কথা। বলে সে,

—ঠিক আছে।

রমেন তার টাকা পেয়ে গেছে, এখন বাদল রায় আর কাজল বুঝে নিক গে তাদের ব্যাপার।

কাজল বসে ছিল রেস্তোরাঁয়। ফাঁকা হয়ে গেছে রেস্তোরাঁ। বাইরের লোকজন বিশেষ আসেনি। বাইরে ঝড়ের গর্জন বেড়ে চলেছে।

তখনও রমেন ফেরেনি।

কাজল চাইল এদিকে ওদিকে। রেস্তোরাঁর লোকজন জানলাগুলো বন্ধ করছে। ওরাও সকাল সকাল যে যার বাড়ি চলে যেতে চায়।

কাজল অধৈর্য হয়ে বের হয়েছে বাইরে।

ঝড়ের দাপট চলেছে। পথগুলো নির্জন। সমুদ্রের বুকে কালো পাহাড়ের মত ঢেউগুলো ফুঁসছে, আছড়ে পড়ে বাঁধের নীচে পাথরে এসে। কি মত্ত আক্রোশে সমুদ্র ফুলে উঠেছে!

ঝাউবন ওই হাওয়ার দাপটে কালো পাঁচিলের মত আছড়ে পড়ে আবার মাথা তোলার চেষ্টা করে। পরক্ষণেই আর একটা দৈত্য যেন ওদের অবাধ্যতায় ওই গাছগুলোর ঝুঁটি ধরে নাড়া দেয় প্রচণ্ডভাবে।

কাজল সমুদ্র আর ঝাউবন, ওই বসতের এই উন্মত্ত বিচিত্র রূপ দেখেনি। সমুদ্র থেকে একদল দৈত্য যেন উন্মাদ হয়ে হানা দিয়েছে এই জনপদে। ঝড়ের দাপটে বাঁধের উপর অস্থায়ী দোকানের চালার বাঁশ, বেড়া ছিটকে পড়ে। একটা দরমার দেওয়াল হাওয়ার সওয়ার হয়ে ছুটে গেল ঝাউবনের দিকে। মেঘের গর্জন মিশেছে সমুদ্রের গর্জনের সঙ্গে। বিদ্যুতের ঝলক উদ্ভাসিত করে ওই বিপন্ন জনপদের কিছুটা। কোন মানুষজন নেই—যেন পরিত্যক্ত একটা ধ্বংসস্তূপ এই দীঘা।

কাজল কি ভেবে ওই বাজারের পাকাবাড়িটার দিকেই চলেছে আশ্রয়ের আশায়। ফাঁকা এই বাঁধ—ঝাউবন ছাড়িয়ে ওদিকে যেতে হবে তাকে। তাদের হোটেলটা বেশী দূর নয়, তবু একা এই ঝড়ের

তাণ্ডবের মধ্যে যেতে ভয় হয়। বিদ্যুৎ চমকে ওঠে—অন্ধকার আকাশ, বাতাস ঊর্মি-উত্তাল সমুদ্রকে সচকিত করে। কাজল ভীত ত্রস্ত পদক্ষেপে চলেছে কোনমতে, মনে হয় ঝড়ের দমকা হাওয়া তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ঝাউবনে ফেলবে।

বাদল রায় রমেনকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় নেমে এসেছে কাজলের সন্ধানে। কিন্তু কাজল তখন সেখানে নেই।

বেয়ারা বলে—এক দিদিমণি তো বসে ছিল, এইমাত্র বের হয়ে গেল।

—তাই নাকি! অবাক হয় রমেন। বিড়বিড় করে সে,

—এই ঝড়-বাদলে গেল কোথায়?

বাদল রায় এখন শিকার হাতছাড়া হয়ে যেতে ক্ষেপে উঠেছে। তার টাকাও দিয়ে দিয়েছে রমেনকে। শীতের এই ঝোড়ো রাতে বাদল রায় কি দুর্বার ভোগের স্বপ্ন দেখেছিল! সেই শিকার হাতছাড়া হয়ে যেতে গর্জে ওঠে বাদল রায়,

—এনেছিলি, না সব ধাপ্পা দিচ্ছিলি রমেন? আমার কাছে ধাপ্পা। ছাল খুলে নেব তোর।

রমেনের এই ব্যবসার বদনাম! এ সহ্য করবেনা সে। আর বেশ রেগে গেছে কাজলের উপর। বোধহয় ব্যাপারটা জেনে ফেলে এবার সরে পড়তে চায় কাজল। রমেনের জাল কেটে পালাবার হিম্মত কারোও হবে না!

রমেন বলে—বিশ্বাস করো দাদা, ছিল ছুঁড়িটা এখানেই।

—কেটে পড়েনি তো? বাদল রায় শুধোয়।

রমেনের উপর এমনি বেইমানি করে কেউ পার পাবেনা। রমেন বলে,

—কেটে যাবে কোথায়? চলো তো—ধরছি ত্যাঁদড় মেয়েটাকে।

বাদল রায় আর রমেন বের হয়েছে পথে।

ঝড়ের উদ্দামতার মাঝে বাদল রায় চলেছে বর্ষাতিতে গা মাথা

ঢেকে একটা মত্ত জানোয়ারের মত।

রমেন বলে—দেখতে পেলে ছুঁড়িকে তুলে নিয়ে আসবে দাদা। চ্যাঁচামেচি করে মুখে রুমাল ঠেসে দেবে।

জনহীন বাঁধ, আলোগুলো নিভে গেছে। কোথায় পোস্ট উপড়ে পড়েছে। হঠাৎ বিদ্যুতের আলোয় দেখা যায় কাজলকে। কোনমতে চলেছে সে একটু আগে আগে ঝাউবনের পাশ দিয়ে। বাদল রায় বলে,

—ওই তো!

শিকারের সন্ধানে বের হয়েছে সে হিংস্র নেকড়ের মত। এতক্ষণ পর সামনে শিকারকে দেখে এবার এসে লাফ দিয়ে পড়ে তার উপর।

—কে! চমকে ওঠে কাজল।

অন্ধকারে দীর্ঘ বর্ষাতি-ঢাকা মূর্তিটা তাকে জড়িয়ে ধরেছে। তার উন্মাদ আক্রমণে বিপর্যস্ত কাজল। জামাটা ছিঁড়ে গেছে। তার সবকিছু লুট করতে চায় ওই দৈত্যটা। কাজলও প্রাণপণে বাধা দিতে চায়। চীৎকার করার চেষ্টা করতে, একটা হাত ওর মুখটা টিপে ধরে।

কাজল হাতের লেডিজ-ছাতার বাঁট দিয়ে অন্ধকারে সজোরে লোকটার মুখে কপালে দু'একটা আঘাত করেছে, লোকটার কপাল দিয়ে রক্ত ঝরে।

সেই জানোয়ারটা মরীয়া হয়ে ওর হাতের ছাতাটা কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে এবার দু'হাত দিয়ে ওর কণ্ঠনালী টিপে ধরেছে। ছিটকে ফেলেছে তাকে ঝাউবনের বালিয়াড়িতে। কাজল হাত-পা ছুঁড়ে তবু প্রতিরোধের চেষ্টা করে—শক্ত দুটো হাত কাজলের চীৎকার থামাবার জন্য দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে তার গলায় চেপে বসেছে, দমবন্ধ হয়ে আসে, দু'চোখ কপালে উঠেছে। ঝড়ের গর্জন, সমুদ্রের কলোচ্ছ্বাস, বিদ্যুতের ঝলক সব মুছে যায়। স্থির হয়ে আসে কাজলের দেহটা। ঠোঁট দিয়ে গড়িয়ে পড়ে তাজা রক্ত।

নিথর দেহটা প্রতিবাদ করার সব শক্তি হারিয়ে ফেলেছে!

চমকে ওঠে বাদল রায়।

উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে সে। মুখে কপালে রক্তের দাগ।

বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টি-ভিজে বালুচরে পড়ে আছে ঝাউবনের ধারে মেয়েটার নিথর দেহ।

রমেন এতক্ষণ দেখছিল ব্যাপারটা।

বাদল রায়কে সে অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে নিজে আড়ালে সরে ছিল। এবার ব্যাপারটা দেখে এগিয়ে এসে চমকে ওঠে রমেন।

—কেস কিচাইন হয়ে গেছে দাদা।

বাদল রায়ের দু'চোখ যেন জ্বলছে।

রমেন বলে—কেটে পড় এখান থেকে।

বালুচর ঝাউবনে তখন ঝড়ের তাণ্ডব চলেছে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। ঢেউগুলো মত্ত গর্জনে ফুঁসছে।

রমেন বলে—খতম হয়ে গেছে ছুঁড়ি। এটাকে সমুদ্রেই ফেলে দিই দাদা। নাহলে মুশকিল হবে। ধরো—

ওরা ধরাধরি করে কাজলের প্রাণহীন দেহটাকে বাঁধের নীচে সমুদ্রের ঢেউয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

…ঘুম আসেনি নিমাই ঘোষের।

দুপুরে বাজার থেকে ফিরে সীমাকে দেখতে পায়নি লজে; হন্যে হয়ে খুঁজেছে, কিন্তু কোথাও পায়নি। দীঘার মত ছোট জায়গাতে বিভিন্ন হোটেলে, পথে বীচে খুঁজেছে, কিন্তু সীমাকে দেখেনি।

ভাবনায় পড়েছে নিমাই মনে হয় কাল রাতে বেদম মদ গিলে সীমার উপর অত্যাচারই করেছে। এমন অত্যাচার সে প্রায়ই করে। কিন্তু চলে যায়নি সীমা। আজ সীমার ব্যবহারে সে রেগে উঠেছে।

পায়নি কোথাও তাকে। মনে হয় সীমা তাকে না জানিয়ে বাড়ি চলে গেছে। এবার সেখানেই বোঝাপড়া করবে তার সঙ্গে। এখানে মাছের দাদন বাবদ বেশ কয়েক হাজার টাকা ছড়ানো আছে, সেটা তুলে নিয়েই ফিরবে। মাছের ব্যবসাতে ক'দিনেই লাল হয়ে যেতো নিমাই, ওই সীমার এমনি ব্যবহারে সেটা হ'ল না। ফিরে গিয়ে এর বিহিত

করবে সে।

বৈকাল থেকেই আকাশের চেহারা বদলে যায়, আতঙ্ক নামে মাছের ব্যাপারীদের মনে। বহু নৌকা দূর সমুদ্রে রয়েছে। কাছা-কাছি যারা ছিল তারা ফিরে আসছে, অনেকেই দূর সমুদ্রে রয়েছে।

ঝড়ের গর্জন ট্যুরিস্ট লজের তেতলায় হানা দেয়।

সমুদ্রের বুক থেকে সোজা ঝড়ের দাপট এসে বাজে, দরজার ছোট্ট ফুটো দিয়ে বাতাস ঘরে ঢুকছে তীক্ষ্ণ শব্দে। নিমাই যেন ঘরে বন্দী হয়ে আছে।

মদও ভালো লাগে না। কিছুটা গিলে সব ভুলে থাকার চেষ্টা করে। সীমা নেই, মেয়েটা তাকেও ঘা দিয়েছে। আর সবচেয়ে বড় বিপদ হয়েছে। নিমাইয়ের এতগুলো টাকা লোভে পড়ে জলে গিয়েছে। এখন এই ঝড়ের মাঝে সে মাছের আশাও নেই। ছটফট করছে নিমাই। কালিঢালা সমুদ্রের মত্ততা লেগেছে তার মনেও.

…বিজনের আশ্রম-স্কুলটা অনেক নিরাপদ ঠাঁইয়ে। সমুদ্র থেকে বেশ দূরে, আর সমুদ্রের ধারে স্তরে স্তরে সাজানো প্রাকৃতিক বালির পাহাড় দু'তিনটে রয়েছে, সমুদ্রের মত্ত তাণ্ডব ওই পাহাড়গুলোয় এসে বাধা পায়। পাহাড়ের ওদিকে সেই কারণে আগেকার মানুষ বসতি গড়েছিল। সেখানে ঝড়ের এত মত্ততা পৌঁছে না।

সীমা তবু বাতাসে ঝড়ের গর্জন শোনে।

আশ্রমের গাছগাছালির বুকে ঝড় উঠেছে। ওদিকে মেয়েদের পাকা দোতলা ছাত্রাবাসের কোণের একটা ঘরে আজ ঠাঁই পেয়েছে সে। দুপুরেই চলে এসেছে সীমা তার মন স্থির করে। পিছনের আর কোন মোহ তার নেই।

বিজন প্রথমে বিশ্বাস করেনি। সে প্রশ্ন করে,

—কি বলছো সীমা! ভেবে দেখেছো?

সীমার পিঠে কপালে সেই রাতের অত্যাচারের চিহ্ন আঁকা। অনেক কিছুই আঁকা আছে তার নারীদেহের সর্বত্র, আর মনেও।

সীমা বলে—সব ভেবেচিন্তেই এখানে এসেছি, বিজন। কপালের ঘা-টা তো টাটকা দেখছো, এমন ঘা আমার সর্বাঙ্গে। সারা দেহে মনে। এসবকে মেনে নিয়ে বাঁচতে পারবো না। তুমি যদি এখানে একটা কাজ, একটুকু আশ্রয় না দাও, আমাকে নিজেকেই শেষ করে এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে হবে!

বিজন চাইল ওর দিকে।

সীমার হু'চোখে ধারা নেমেছে। আজ বিজনও তার জন্মে মমতা-বোধ করে। তবু নিজের প্রতিষ্ঠানের কাজে তার ব্যক্তিগত কোন মোহের স্থান সে রাখতে চায় না।

বিজন বলে—এখানে কাজ করতে হবে। শিক্ষকতাই করবে তুমি। বিলাস নেই, শুধু কষ্ট করে কাজের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পেতে হবে। এ বড় কঠিন সাধনা। তুমি পারবে?

সীমা বলে—সব মোহ আমার মুছে গেছে, বিজন। আমি তাই নোতুন করেই বাঁচতে চাই কোনো কাজের মধ্যে।

বিজন বলে—ঠিক আছে। লাবণ্যদিকে বলে দিচ্ছি। উনি গার্লর্স স্কুলের চার্জে। ওর আণ্ডারেই থাকবে তুমি।

সীমার নোতুন আশ্রয়ে আজ প্রথম রাত্রি। ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে বৃষ্টির ধারা নামে। সারা আশ্রমে নেমেছে রাতের অন্ধকার। সীমা এই অন্ধকারে যেন এসেছে কি তামস-তপস্যায় রত হতে। পিছনের সবকিছু তার হারিয়ে গেছে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না। সীমা যেন নিমাইয়ের সামনে এসেছে। মত্তপ লোকটার মুখে শানিত হাসির দীপ্তি। ওর শক্ত হাতটা সীমার টুঁটি টিপে ধরেছে। তার সব অবাধ্যতার শাস্তি দেবে আজ নিমাই। অস্ফুট আর্তনাদ করছে সীমা।

হঠাৎ ঘণ্টার শব্দ কানে আসে। বহুদূরে কোথায় ঘণ্টা বাজছে। উঠে বসলো সীমা। চমকে ওঠে, নিমাই এখানে নেই। সে এসেছে বিজনের আশ্রমে।

প্রভাতী ঘণ্টা বাজছে। ভোরে উঠে ছাত্রছাত্রীর দল সমবেত প্রার্থনা করছে সামনের মাঠে। সব আশ্রমিকরাও গেছে।

সীমাও উঠে পড়ে, চটপট তৈরি হয়ে গায়ে চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে ওই প্রার্থনায় যোগ দেয়।

পাখির কাকলি জাগে, রাতের ঝোড়ো হাওয়ার মত্ততা কেটে ভোরের মেঘমুক্ত আকাশে প্রথম আলোর শিহর জাগে। প্রার্থনার সুর ছড়িয়ে পড়েছে সদ্যস্নাত প্রভাতের স্নিগ্ধতার মাঝে। সীমার মনের অনেক জ্বালা যেন এই পরিবেশে মুছে যায়।

এই জীবনকে সে তার অজান্তেই ভালোবেসে ফেলে।

লাবণ্যদি ওকে দেখে মিষ্টি হেসে বলেন—প্রার্থনায় এসেছো? এরপর তৈরি হয়ে অফিসে এসো। ক্লাসের রুটিন দিয়ে দেবো।

সীমা নোতুন জীবনের কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে সব জ্বালা ভুলতে চায়।

…ঝড়ের মত্ত তাণ্ডব গেছে কাল রাত্রে।

হঠাৎ ঝড় তুফান এসে পড়েছিল কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে। অসময়ের দুর্যোগ। বর্ষাকালে এমন কাণ্ড চলে কয়েকদিন ধরে, তার জন্যে সকলেই তৈরি থাকে। কিন্তু শীতকালের এই দুর্যোগ ক্ষণস্থায়ী হলেও তার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম নয়।

ঝড়ের মত্ততার পর দীঘায় নেমেছে ক্লান্তির আবেশ। ভোরের দিকে আকাশের মেঘগুলো সরে যায়, আবার সূর্য ওঠে। সমুদ্র কিছুটা শান্ত, তবু তার বিক্ষোভ তখনও রয়েছে কিছুটা।

কাল থেকে বন্দী মানুষগুলো আরও কি সর্বনাশের ভয়ে ভীত হয়ে ছিল, কিন্তু ভোরের থেকেই আকাশ মেঘমুক্ত হতে তারাও দল বেঁধে এবার ঝড়ের তাণ্ডবের পর দীঘাকে দেখার জন্য বের হয়ে পড়েছে।

হিম-হাওয়ার তীক্ষ্ণ ছোঁয়াটুকু সূর্যের উত্তাপে ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। বাজারের বাঁধা দোকানদাররা ঝাঁপ খুলেছে। দীঘার পথে ঝড়ে ভাঙা ঝাউগাছের ডাল ছড়ানো। সমুদ্রের ধারের অস্থায়ী দোকানের চালা,

বেড়া ছিটিয়ে পড়েছে। কাৎ হয়ে পড়ে আছে দু-একটা ঠ্যালাগাড়ির চলমান দোকান। কোথাও বিজলির তারগুলো খুঁটি-সমেত হেলে পড়েছে বিপজ্জনক ভাবে।

সমুদ্রের তীরে এসে বালিয়াড়িতে পড়ে আছে গাছের ডাল, কোন নৌকার লগি, ভাঙা তক্তা, নানা কিছু।

আবার ভাঙা হাট জোড়া দিয়ে বসছে দোকানীরা। ওদিকে বাঁধের নীচে সমুদ্রের বুকে একটা অর্ধচন্দ্রকার বালিয়াড়ি—ওখানে মাঠের জলনিকাশী বাঁধের ছোট স্লুইশ গেট, চারিপাশে ঘন ঝাউবন।

সেখানের বালিয়াড়িতে সমুদ্রের ঢেউ ছিটকে এনে জমা করে রেখে গেছে একটি মেয়ের মৃতদেহ। শাড়িটা সারা শরীরে জড়ানো, জামাটা ছিঁড়ে তার দেহের কিছুটা উন্মুক্ত, দু'চোখে ভীত বিস্ফারিত চাহনি, বালিয়াড়িতে পড়ে আছে প্রাণহীন দেহটা।

এ খবর হাওয়ার বেগে দীঘার সারা জনপদে ছড়িয়ে পড়ে।

শান্ত দীঘার জীবনে মাঝে মাঝে এমন কাণ্ড ঘটে। হয় সমুদ্রে যায়, না-হয় কেউ কি অভিমানে নিজেকে শেষ করে এখানে এসে।

…লোকজন জুটে গেছে নানা জনে ভিড় করেছে।

হরিপদ সরকার মণিমালাকে নিয়ে সকালে বেড়াতে বের হয়েছে। হঠাৎ ওই ভিড় দেখে মণিমালা এগিয়ে যায়—কি হচ্ছে এখানে গো?

ভিড়ের মধ্যে উঁকি মেরে ওই দৃশ্যটা দেখে চমকে ওঠে মণিমালা। হরিপদ সরকার বিচক্ষণ বিষয়ী লোক। সে দেখেছে ওই মেয়েটিকে। মনে হয় চেনাই। মণিমালাকে বলে—চল গিয়া। রাম—রাম!

লোকজনদের মধ্যে আলোচনাও হয়।

—সমুদ্রে ঝড়ের সময় পড়ে গেছল, ওই ঢেউয়ে শেষ হয়ে গেছে বেচারা!

কে প্রশ্ন করে—সঙ্গে কেউ নেই?

—হয়তো খবর পায়নি।

হরিপদ সরকার স্ত্রীকে নিয়ে সরে এল। মণিমালা বাইরে এসে বলে,

—হ্যাগো, মেয়েটি আমাদের সঙ্গে বাসে এসেছিল না ? সঙ্গে একটি ছেলেও ছিল।

হরিপদ সরকার জানে এসব বিষয়ে না-জানার ভান করাই নিরাপদ। তাই স্ত্রীকে সাবধান করে—থামো দেহি! এসব কথা বাইরে একদম কইবা না। জানি না, চিনি না। ব্যস! চুপ মাইরা থাকো। পুলিশ শুনলি ঝামেলা বাধাইবো।

মণিমালা চুপ করে যায়।

মিনতিও আসছিল এদিকে, সমরকে নিয়ে বাজারে যাবে। হঠাৎ তারাও দাঁড়িয়েছে ওই ভিড় দেখে। তখন পুলিশ এসে গেছে। পুলিশ অফিসার দীপক চৌধুরীও দেখছে মেয়েটিকে, নিজেও ফটো তুলতে পারে, কয়েকটা স্ন্যাপ নিচ্ছে।

চমকে ওঠে মিনতি ওই প্রাণহীন দেহটা দেখে। মনে পড়ে তার, এক-বাসেই এসেছিল তারা। সেদিন সমুদ্রে স্নান করার সময় পরিচয়ও হয়েছিল মেয়েটির সঙ্গে।

তাকে চাকরীর ব্যাপারেও বলেছিল। আজ তার জীবনের সব কলরব স্তব্ধ হয়ে গেছে।

মিনতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। কে জানে মেয়েটি নিজেকেই শেষ করেছে সব জ্বালা জুড়োতে, না অন্য কিছু ঘটেছে ?

তবে দুঃখ হয় ওর জন্যে। মিনতি দেখছে ভিড়ের মধ্যে ওই কৌতূহলী মুখগুলোর দিকে চেয়ে। শোকসন্তপ্ত কেউ নেই।

পুলিশ অফিসারও জানতে চায় জনতার কাছে।

—একে কেউ চেনেন ? এর সঙ্গে আর কে এসেছিলেন ?

কোন জবাবই কেউ দেয় না।

পুলিশ অফিসার দীপকবাবু ভাবনায় পড়েছে। তার মনে পড়ে মেয়েটিকে এক নজর দেখেছিল সেই হোটেলের রেস্তোরাঁয়। এর বেশি কিছু খবরই নেই। পুলিশ লোক সরাবার চেষ্টা করে।

দীপকবাবু বলে—ডেড-বডি মর্গে চালান দিয়ে দাও। পরে দেখা যাবে।

পুলিশ তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

লোকজনের ভিড় পাতলা হয়ে যায়। তখনও বালুচরে যেন শোকের স্তব্ধতা নেমে আছে।

মিনতি কি ভাবছে।

সমর বলে—স্যাড ডেথ। সঙ্গে সেই দাদাটিও নেই!

মিনতি বলে—তাই দেখছি। ব্যাপার-স্যাপার দেখে সে সরে পড়েছে। আর দাদাই বা আসলে কি, কে জানে!

সমর শোনায়—পুলিশ সব খবরই বের করবে।

তবু মনটা কেমন উদাস বিষণ্ণতায় ভরে ওঠে। সেই বিষণ্ণতার সুর যেন সারা বালুচরে আজ ছড়ানো।

মাছের বাজারের সেই কর্মব্যস্ত এলাকায় শোকের ব্যাকুলতার আর্তি নেমেছে। বালিয়াড়িতে আঁকা আছে কাল রাত্রের সর্বনাশা দুর্যোগের চিহ্ন। আশপাশের গ্রামের মাছমারা পরিবারের মেয়েছেলেরা সকলেই আসে ঘর ছেড়ে মাছের বাজারের বালুচরে; ঝাউবনে বালিয়াড়িতে সমুদ্র-ফেরা মানুষগুলোর জন্য পান্তাভাত, মাছপোড়া, খাবার জল আনে। রাতভোর সর্বগ্রাসী ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিয়ে জাল টেনে ওরা ডাঙায় ফিরে গোগ্রাসে সেই খাবার খায়। পাশে বসে থাকে স্ত্রী, কারোর মা।

এখানের সেই স্বাভাবিক রূপটা আজ বদলে গেছে।

মাছের আড়তদারদের কর্মব্যস্ততা নেই। মাছের গাদার সামনে নীলাম হাঁকার দৃশ্যও চোখে পড়ে না। মাছমারাদের আপন জন অন্য লোকগুলো এখানে ওখানে বসে শূন্যদৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে দূর সমুদ্রের দিকে। দেখছে কেউ ঘরে ফিরলো কিনা, কোন নৌকাবহর ফিরে আসছে কিনা।

হঠাৎ কলরব ওঠে।

দূরে দেখা গেছে কয়েকটা নৌকা, একটা লঞ্চ কোনমতে কঁকাতে কঁকাতে তাদের টেনে আনছে।

তীরে এসে ভিড়তে সকলেই দৌড়ে যায়।

বালুচরে কেউ জড়িয়ে ধরে ক্লান্ত বিপর্যস্ত আপনজনকে। কেউ হাহাকার করে ওঠে। সঙ্গের ছুটো নৌকা আর ফেরেনি। তুফানে ডুবে গেছে সমুদ্রে। বালুচর আজ কান্নার রোলে ভরে ওঠে।

কোন দল এখনও ফেরেনি সমুদ্র থেকে।

নিমাই বসে আছে মাছের শূন্য আড়তের তক্তপোশে। শূন্য আড়ত। মাছ আর নেই। নৌকাবহর লঞ্চও ফেরেনি। নিমাইয়ের মুখচোখ শুকনো, সে বলে—তিরিশ হাজার টাকা জলে গেল!

মহাজন জবাব দেয়—আপনার তিরিশ গেছে। আমার? পঁচিশ হাজারের জাল, তিনখানা নৌকা লঞ্চ। ছু'লাখ টাকার কি হবে?

ওদিকে বুক চাপড়ে কাঁদছে ছু'তিনটে জেলের বউ, ন্যাংটো বাচ্চাগুলো শীতে কাঁপছে। মেয়েরা ওদের ওই হিসাব শুনে বুক চাপড়ে আর্তনাদ করে ওঠে—আমাদের যে ঘরের মানুষগুলো গ্যালো গ? তার দাম কতো?

ওদিকে সেই মাছমারাদের বাচ্চা ছেলে কিশোরীকে ঘিরে কয়েকজন ভিড় করেছে।

সমর, মিনতিও এসেছে এদিকে। শুনছে আজ বালুচরে এই অসহায় মানুষগুলোর আর্তনাদ। জীবন এখানে নির্মম, নিষ্ঠুর। শান্ত প্রকৃতির রুদ্ররোষের এরা বলি হয়। তবু এই জীবনকেই মেনে নিতে হয়েছে এদের।

মিনতি চিনতে পারে সেদিনের সেই ছেলেটাকে।

কিশোরীর চোখে মুখে তখনও গতরাতের আতঙ্কের ছায়া। চুলগুলো রুক্ষ—সারা দেহে নুনের দাগ। চোখ ছুটো লাল। কিশোরী বলে,

—ত্যাকন দূর দরিয়ায়। ঝড় উঠলো। বড়মামা হাল ধরি আছে, ইয়া তালগাছের মতন ঢেউ। নৌকা ছু'বার আছাড়ি বিছাড়ি খেয়ে ছিটকে পড়লো—জলে তলিয়ে গেলাম। কে কোতায় গ্যালো জানতিও পারিনি। ঢেউয়ে উঠি, আবার ছিটকে নে যায়, হাতের কাছে পেয়ে গেলাম জালের একখানা বড় পেলাসটিকের বল। আঁকড়ে ধরলাম

দড়িশুদ্ধ।

ওই ছোট ছেলেটার মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ের কথা শুনছে সবাই। কয়েকঘণ্টা ওই তুফানে হিম জলে পড়ে ছিল বলটা আঁকড়ে, শেষকালে কোন ঘরে ফেরা লঞ্চ ওকে দেখে কোনরকমে বাঁচায়।

কিশোরীর ত্ব'চোখে জল নামে। বলে সে,

—আর কাউকে দেখিনি দলের। বড়মামা বাবা দাদা সবাইকে সাগরে নে গেল বাবু!

ফুঁপিয়ে কাঁদছে ছেলেটা।

এ যেন শোকের রাজ্য। মিনতি বলে সমরকে,

—চলো, ফেরা যাক।

কিশোরীর শোকও থেমে গেছে। খিদেতে—শীতে কাঁপছে সে। কি ভেবে ছেলেটা বলে—একটুন চা-পাউরুটি খাওয়াবা দিদিমণি? আজ মহাজনের সব্বোনাশ হয়েছে। পয়সা খোরাকীও দেবেনি। জাড়ে কালিয়ে গেছি।

শোক ছাপিয়ে ওর জৈবিক ক্ষুধাটাই বড় হয়ে উঠেছে বাঁচার তাগিদে।

মিনতি চাইল ওর দিকে।

কি ভেবে বলে—চল।

চায়ের দোকানে এসে পাউরুটি, ত্ব'তিনটে ডিমের ওমলেট দেখে কিশোরী শুধোয়—ইসব আমার?

মিনতি বলে—হ্যাঁ।

ছেলেটা গোগ্রাসে গিলছে। চায়ে চুমুক দিয়ে এবার ধাতস্থ হয়ে বলে কিশোরী—আর ওই মারকুটে সমুদ্রে যাবো নি দিদিমণি। কলকাতায় তুমাদের ওখানে একটা কাজ দিবা? ঝা কাজ বলো করবো। তবু ডাঙায় থাকবো। ওই জলে আর লয়।

সমর দেখছে ওকে। শুধোয় সে—কোথায় বাড়ি তোর?

কিশোরী বলে—বাড়ি ওই অলংকারপুরে। হোথা। ঘরে মা একা আছে। মা তো সকালে এসে বলেছে—আর জালে যাবি না।

মিনতির মাকে দেখার জন্য একজনের দরকার।

ছেলেটাকে ভালো লাগে তার। বলে—সত্যি কাজ করবি কলকাতায় ?

—নিয্যাস্। ছেলেটা মাথা নাড়ে।

মিনতি বলে—চল্ আমাদের বাসা দেখে যাবি, বাড়িতে গিয়ে কথা হবে। তোর মাকেও শুধিয়ে এসে কাল-পরশু জানাবি যাচ্ছিস কিনা।

কিশোরী খুশিভরে বলে—ঠিক আছে। তা হলে চলেন আপনাদের বাসাটা দেখিয়ে দেবেন।

কিশোরী খুশির চোটে গলগল করে নানা খবর দিয়ে চলেছে। দীঘার বাজারে এসে জিনিসপত্র বোঝাই থলিগুলো নিজেই ঘাড়ে নিয়ে, কোন চেনা মাছওয়ালার কাছে দর করে পুকুরের মাছ কিনে বয়ে নিয়ে যায় মিনতির কটেজের দিকে।

সমর বলে—তোমার বাহন তো জুটে গেছে। তাহলে আমি সৈকতাবাসে যাচ্ছি।

মিনতি শোনায়—বৈকালে আসবে কিন্তু। না হলে মা আবার ভাববে।

সমর বলে গলা নামিয়ে—মা না মায়ের মেয়েটি ভাববেন ?

হাসে মিনতি। চাপা স্বরে ধমকে ওঠে—ধ্যাৎ!

কিশোরী এসব দেখেও দেখে না। সে তখন কলকাতা নামক কল্পনার সহরে পাড়ি দিয়েছে।

ভবতারিণীও খুশি হয় ছেলেটাকে দেখে। কিশোরীও কাজের ছেলে। এসেই ঘরে ঝাঁটপাট দিয়ে উনুন ধরিয়েছে। নিপুণভাবে তরকারী কাটে, মাছ বাছে।

কিশোরীকে নৌবহরের রসুইয়ের কাজ করতে হয় জাল ফেলার অবকাশে, তাই এসব ও করে দেয়। ভবতারিণী বলে—খেয়ে-দেয়ে যাবি।

কিশোরীর আজ খোরাকি নাই, এভাবে খোরাকি জুটে যাবে তা ভাবেনি।

সে বলে—তাই যাবো, মা।

ভবতারিণী বলে—তাহলে মাকে শুধিয়ে আসবি। না হয় নিয়েই আসবি তোর মাকে আমার কাছে। আমি কথাবার্তা বলবো।

কিশোরী ঘাড় নাড়ে।

পুলিশ অফিসার দীপক চৌধুরী, মেয়েটির মৃতদেহ কণ্টাই-এর সাবডিভিশন্যাল মর্গে পাঠিয়ে দেয়। ব্যাপারটা তার কাছে সন্দেহজনক বলেই মনে হয়েছিল।

এমনি ঝড়ের রাতে একা একটি মেয়েছেলে সমুদ্রের ধারে কেন যাবে সেটা একটা প্রশ্ন, আর সমুদ্রে কোনমতে পড়ে গেলে ডুবে মরতে পারে, কিন্তু কাল রাতে নিজেও দেখেছে দীপকবাবু সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ রূপ। ঢেউগুলো সগর্জনে এসে আছড়ে পড়েছিল। তাতে মাথা ফেটে চৌচির হতে পারতো।

তাও হয়নি বিশেষ। মেয়েটির ফরসা দেহ, গলায় দেখেছিল নীল কালসিটের দাগ। আরও বিস্মিত হয়েছিল মেয়েটির হাতের বদ্ধ-মুষ্টিতে রয়েছে একটা বড় বোতাম। মরার আগে সেইটাকে কঠিন মুষ্টিতে চেপে ধরেছিল বোধহয়।

…বেলা পড়ে আসছে।

থানায় জেলে-বসতি থেকেও খবর আসছে। বেশ কিছু নৌকা এখনও ফেরেনি। রেডিও মেসেজ দিয়েছে সদরে, এদিকে কয়েকটি লঞ্চ এখনও তল্লাসী চালাচ্ছে। এ নিয়েও থানার বাইরের মাঠে অনেকে এসেছে। কান্নাকাটিও করছে তাদের প্রিয়জনদের শোকে।

দীপক চৌধুরী জানে এদের জীবনে এমন সর্বনাশ প্রায়ই ঘটে। ওরা সমুদ্রে যায় আর ফেরে না। তবু ওই গ্রামের কেন, বিভিন্ন জেলে-বসতের মানুষকে সমুদ্রে যেতেই হবে।

দীপকবাবু ওদের সান্ত্বনা দেয়,

—আমরা সমুদ্রে লঞ্চ পাঠিয়ে খোঁজ করছি। কোন খবর পেলেই জানাবো।

...থানার থার্ড অফিসারকে ঢুকতে দেখে চাইলো দীপকবাবু,
—কোন খবর পেলেন সান্ন্যালবাবু ?

সান্ন্যালবাবু পুরানো আমলের লোক। বিশেষ বিশেষ কার্য-কলাপের জন্য সান্ন্যালবাবুর প্রমোশন আর হয়নি। চুলে পাক ধরেছে। সান্ন্যালবাবু বলে—খোঁজখবর তো নিলাম, স্যার। মনে হয় সিলভার লজে একজোড়া চিড়িয়া উঠেছিল, কাল ভোর থেকে তাদের পাত্তা মিলছে না। মালপত্র পড়ে আছে মেয়েটির। ছোঁড়াটা ভোরেই কেটে পড়েছে। আর সেগুলো জমা করিয়েছি হোটেলে। নাম ঠিকানাও এনেছি, স্যার।

দীপক দেখছে নাম-ঠিকানাটা।

বলে সে—এসব ফল্‌স ঠিকানা। নামটাও। তবু একবার রেডিওগ্রাম করুন কলকাতায়। দেখুন পাত্তা মেলে কিনা। আর ওই স্যুটকেসপত্র আনান এখানে। দেখুন যদি কিছু আসল পাত্তা মেলে।

সান্ন্যালবাবু ঘাড় নাড়ে, খুব খুশি হতে পাবেনি সে। কারণ দীঘায় এমন ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে। ওসব ব্যর্থ প্রেম-ট্রেমের পরিণতিও হতে পারে। তা নিয়ে মাথা-ঘামানোটা পছন্দ করেনা সান্ন্যালবাবু, তার চেয়ে অন্যদিকে নজর দিলে কিছু সুরাহা হতো।

কিন্তু দীপকবাবু কড়া অফিসার, সে তদন্ত চালাবেই। তাই সান্ন্যালবাবুর বাজে কাজও কিছু বাড়লো।

নিমাই ঘোষ ঝোড়ো কাকের মত এসেছে থানায়। ওদিকে মাছের কারবারে দু'দিনের লাভের টাকা মায় পকেটের মূলধন অবধি চলে গেছে সমুদ্রের জলে। একদিনের ঝড়েই তার অনেক টাকা গেছে। মাছ-মহাজনের নৌকাবহরও গেছে। কবে, কিভাবে সে টাকা ফেরত পাবে তা জানেনা নিমাই। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে।

তার উপর সীমাও কাল থেকে কোথায় চলে গেছে। কলকাতার বাড়িতেও ফোন করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ঝড়ের জন্য লাইনও পায়নি। কে জানে সীমা কোথায় !

এমন সময় সমুদ্রে একটি মেয়েকে মৃত অবস্থায় পাবার কথা শুনে চমকে ওঠে নিমাই। কে জানে সীমাই হবে কিনা!

নিমাইয়ের কাছে সীমা একটা সম্পদই। তার টাকা, আসবাবপত্র ইত্যাদির মত সীমা আর একটা পরিচয়—সম্পদ। সেটাকে হাতছাড়া করতে রাজী নয় সে।

নিমাই বীচে এসে খোঁজ খবর করছে।

ততক্ষণে ডেড-বডিটা থানায় তুলে এনেছে পুলিশ। নিমাইও দৌড়লো থানার দিকে।

সান্ন্যালবাবু অবাক হয় নিমাই ঘোষকে ঢুকতে দেখে।

—কি ব্যাপার?

নিমাই বলে—বীচে একটি মেয়েকে পেয়েছেন আপনারা। তাকে একটু দেখতে চাই।

সান্ন্যালবাবুর গোঁফজোড়াটা এবার সোজা হয়ে ওঠে। আজ সে-ই এই কেসের আসামীকে ধরেছে নিজে! সান্ন্যালবাবু এবার পুলিশী মেজাজে বলে—বসুন। বলি এসব নাটক কতদিন করছেন? এই লভ্—প্রেম-প্রেম খেলা? অ্যা।

নিমাই ঘোষ চাইলো ওর দিকে।

ধমকে ওঠে সান্ন্যাল—কি হ'ল? জবাব দাও। এবার ওই লাশ সমেত চালান দেবো সদরে। হাজতে থাকলে বুঝবে মজা।

নিমাই বলে—আগে দেখতে দিন। কাল দুপুর থেকে আমার স্ত্রীকে পাচ্ছি না। ট্যুরিস্ট লজে উঠেছি। কলকাতার বউবাজারে আমার বাড়ি—

—সব কুষ্ঠি-ঠিকুজী বের করবো টেনে। সান্ন্যাল গজরায়।

দীপকবাবুও খবরটা পেয়ে এসেছে। বলে সে,

—উনি বলছেন ওঁর স্ত্রী, কিন্তু এই ভদ্রমহিলা তো বিবাহিতা নন।

সান্ন্যাল শোনায়—ক্যামন স্ত্রী তাই শুধোন ওকে? দীঘায় এসে এমন স্বামী-স্ত্রী অনেকেই সেজে যায় স্যার শাঁখা সিঁদুর না পরেও।

নিমাই ঘোষ বলে—কি যা-তা বলছেন? ঘরের বউ—বউবাজারের

ঘোষবাড়ির বউ।

দীপকবাবু বলে—দেখে আসুন ও-ঘরে আছেন তিনি।

নিমাই ব্যাকুল হয়ে দেখতে যায়।

ফিরে আসে নিশ্চিন্ত হয়ে। না। সীমা এ নয়। অন্য একটি মেয়ে।

আরও মনে পড়ে—একে দেখেছিল সে তাদের সঙ্গেই এক বাসে এসেছিল।

দীপকবাবু দেখছে নিমাইকে। ওর নিশ্চিন্ত ভাবনামুক্ত মুখচোখ দেখে সে বুঝেছে তার স্ত্রী এ নয়।

নিমাই বলে—না স্যার। আমার স্ত্রী নয়। তবে মেয়েটিকে দেখেছিলাম আগে। চার-পাঁচদিন হ'ল এক-বাসেই এসেছিলাম মনে হচ্ছে। সঙ্গে একটি ছেলে ছিল। কালো জার্কিন পরা—লম্বা চুল।

দীপকবাবুরও মনে পড়ে সেদিন রেস্তোরাঁয় দেখেছিল ওই মেয়েটির সঙ্গে কালো জার্কিন পরা লম্বা চুলওয়ালা এক মস্তান টাইপের ছেলেকে, ওরা দুজনে হোটেলের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে ছিল।

নিমাই বলে—তাহলে আসি স্যার। নমস্কার।

দীপকবাবু বলে—ঠিক আছে।

বের হয়ে গেল নিমাই কিছুটা নিশ্চিন্ত মনে। সীমা মারা পড়েনি। এ আর কেউ।

সান্ন্যাল বলে—ওকে ছেড়ে দিলেন স্যার? বেগতিক দেখে চেপেই গেল বোধহয়।

দীপকবাবু মানুষ চেনে। সে চাইল সান্ন্যালবাবুর দিকে। বলে—পুলিশে কাজ করে শুধু লোককে হ্যারাস করতেই শিখেছেন, চিনতে শেখেননি। আসল অপরাধীকে ধরার চেষ্টা না করে নিরীহ লোকদের উপর জুলুম করতে চান?

সান্ন্যাল উপরওয়ালার কথায় চুপ করে গেল। দীপকবাবু বলে,

—যা বললাম তাই করুন। ওই হোটেল থেকে মালপত্র আনান। আর ডেড-বডি মর্গে পাঠান এবার। রিপোর্ট যেন একটু তাড়াতাড়ি

আসে তাই দেখবেন।

সান্ন্যাল চুপ করে যায়।

মৃত্যুর একটা অদৃশ্য ছায়া আছে যা মানুষের মনের খুশির আলোকে কিছুটা ম্লান করে। মিনতি ক'দিন এখানে এসে কলকাতার সেই একঘেয়ে জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছিল। আনন্দের অজানা সুর উঠেছিল তার মনে। বিচিত্র অচেনা সেই সুর তার মনে একটি আশ্বাস এনেছিল।

সমরকে চিনেছিল এখানে এসে মিনতি।

দেখেছিল তার মা-ও সমরকে দেখে খুশি হয়েছে। মিনতিও। কিন্তু মায়ের সামনে মিনতি সেই খুশিটাকে প্রকাশ করতে চায়নি, হয়তো লজ্জাই করে তার!

তবু তার কুমারী মন কি যেন স্বপ্ন দেখেছিল একজনকে কেন্দ্র করে। সমরও তার অনেক কাছে এসেছে।

হঠাৎ ওই মেয়েটির মৃত্যু মিনতির মনে কি বেদনা এনেছে। এই মেয়েটিকে সে চিনেছিল। সেদিন সমুদ্রে এসে কাজলও বলেছিল তার নিজের কথা। একটা চাকরী চায় সে—সেও বাঁচতে চেয়েছিল সবকিছু পেয়ে।

কিন্তু হঠাৎ এভাবে মারা গেল কেন? হয়তো এই দুনিয়ার উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে সে নিজেকে শেষ করেছে। আশা স্বপ্ন.তার জীবনে ব্যর্থ হয়ে গেছে। ওই মৃত মেয়েটি সেই ব্যর্থতারই মূর্ত প্রতীক।

ভয় হয়, মিনতির জীবনেও যদি তবে এমনি সর্বনাশ ঘনিয়ে আসে? মিনতি এভাবে ব্যর্থ হয়ে শূন্যহাতে পৃথিবী থেকে ফিরে যেতে পারবে না। কি দুঃসহ বেদনায় মিনতির মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

ভবতারিণী দেখছে মেয়েকে। শুধোয় সে,

—কি হল রে তোর? শরীর খারাপ নাকি?

মিনতি খেতে বসে ভাত নাড়াচাড়া করে উঠে গেল। মায়ের কথায় বলে,

—না। খিদে নেই।

ভবতারিণী মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে বলে—বিদেশ-বিভূঁই জায়গা, আবার জ্বর-ফর বাধাসনে বাপু। বললাম সমুদ্রে চান করতে যাস নে। কে জানে ঠাণ্ডা-ফাণ্ডা লাগলো নাকি।

মিনতি বলে—ওসব কিছু নয়। একটু ঘুমুলে ঠিক হয়ে যাবে।

ভবতারিণীর ভাবনা যায় না।

সেই ছেলেটাই আজ তুপুরে খেয়ে বাসন মেজে ধুয়ে বলে,

—শরীরে নোনা লাগলে এমন হয় গো। উ কিছু নয়। তা সেই দাদাবাবুকে ডেকে আনবো? সেকতাবাস আমি চিনি।

মিনতি ধমকে ওঠে—তুই থাম তো।

ভবতারিণী বলে—মন্দ বলেনি বাপু। তা কিশোরী তুই বাড়ি যাবার মুখে একবার খবর দিয়ে যাবি বাবুকে। বলবি সমরবাবুর ঘর কোন্‌টা।

মাথা নাড়ে কিশোরী।

ভবতারিণী ওকে একটা টাকা দিয়ে বলে—কাল তোর মাকে আনবি। কথা বলে নোব।

কিশোরী টাকাটা সযত্নে ট্যাকস্থ করে বিদায় নিল।

হরিপদ সরকার তুপুরের ঘুমের পর গরম চা পেয়ে খুশি হয়েছে। ক'দিনে মণিমালাও যেন বদলে গেছে। স্বামীকে এখন একান্তে পেয়ে সেও তার সেবাযত্ন নিয়ে মেতেছে। আর কর্মব্যস্ত হরিপদ সরকারও এতদিন ধরে শুধু ব্যবসা আর টাকার পিছনে ছুটেছিল—জীবনে দাঁড়াবার; বিশ্রাম করার জীবনকে থিতিয়ে উপভোগ করার মত কোন অবকাশই পায়নি। এখানে এসে জীবনের সেই দিকটাকে দেখে নোতুন করে চিনেছে নিজেকে, মণিমালাকেও।

মণিমালা বলে—চা খেয়ে চলো বেড়াতে যাবে না?

হরিপদ বলে—তা যামু। তবে বাপু সন্ধ্যার পর ওই বাঁধে বসা-টসা ঠিক হইব না।

—কেন? মণিমালা চাইলো স্বামীর দিকে।

সন্ধ্যার পরও তারা ঘোরে—না-হয় বসে থাকে দুজনে। সামনে-সমুদ্রের অশান্ত গর্জন—দুজনে যেন কোন অচেনা জগতে হারিয়ে যায়। মণিমালার এই একান্তভাবে পাওয়াটুকু ভালো লাগে। সমুদ্র যেন দিনের আলোয় একরকম, রাতে তার রূপ আলাদা। ঢেউয়ের গর্জনে কি বিচিত্র সুর ওঠে! তাই মণিমালা এইসময় এসে ঘরে ঢুকতে চায় না। হরিপদ বলে,

—জায়গাটা নিরাপদ বোধ হইতেছে না? দেখলা না একটা মাইয়ারে শেষ করছে! কে জানে মারছে, না লভ্-টভ কইরা সমুদ্রে ঝাঁপ দিছে।

মণিমালা হরিপদের কাছে এসে ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে,

—লভ্ তো আমিও করেছি গো! তোমাকে। তবে কি আমাকেও অমনি করে মরতে হবে?

হরিপদ মণিমালাকে কাছে টেনে নেয়।

আবেগভরে বলে হরিপদ—ওসব কথা কইবা না নোতুনবউ। স্বামী-স্ত্রীর লভ্ পবিত্র জিনিস। সংসারটারে সুন্দর কইরা তোলে। আর লুকাই-চুরাই যা করে ওটা নোংরামি। ওরে লভ্ কইবা না।

হরিপদ মণিমালাকে আরো কাছে টেনে নেয়।

মণিমালা নিঃশেষে সঁপে দেয় নিজেকে ওই লোকটার নিবিড় বন্ধনে। জীবনে এত পাওয়ার স্বপ্ন সে আগে দেখেছিল, আজ সেটা সত্যে পরিণত হয়েছে বাইরের আঘাত, ওই সমুদ্র যেন মণিমালার জীবনকে নোতুন করে গড়ে তুলেছে। অনেক কিছু পেয়েছে সে।

তাই মণিমালার মনে পড়ে সেই ব্যর্থ মেয়েটির কথা। জীবনে সে হয়তো কিছুই পায়নি। পেয়েছে শুধু জ্বালা আর শূন্যতা। সেই বেদনা নিয়েই ফিরে গেছে কাজল এই পৃথিবী থেকে শূন্যহাতে।

নিমাই ঘোষ শূন্যহাতে ফিরেছে, দীঘায় তার অনেককিছুই হারিয়ে গেছে। টাকাগুলোও জলে গেছে। অনেক টাকা। সীমাও

হারিয়ে গেছে তার জীবন থেকে। এর আগেও সীমা দু'একবার বলেছিল তার চলে যাবার কথা। বিশ্বাস করেনি নিমাই।

আজ সত্যিই সে চলে গেছে।

শূন্যমনে ফিরছে নিমাই। কাল ভোরের ফার্স্ট বাসেই ফিরে যাবে সে। কলকাতায় গিয়ে সীমাকে যদি বাড়িতে না-পায়? সে কথাটা ভেবে শিউরে ওঠে।

...টাকা—স্ত্রী। সব গেছে তার।

মদের বোতল বের করেছে। বৈকাল থেকেই মদ খেতে শুরু করেছে। মনের এই হাহাকার যন্ত্রণাগুলো তাকে অস্থির করে তুলেছে। এসব কিছু থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়, তাই মদই গিলছে।

জিনিসপত্রও প্যাক করা হয়ে গেছে।

কাল ভোরের আলো ফোটবার আগেই সে বের হয়ে যাবে এখান থেকে। ট্যুরিস্ট লজের দু'চারজন পরিবার যেন তাকে দেখে ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

স্ত্রী একটা সামাজিক পরিচয়। যে পুরুষের স্ত্রীও তাকে ছেড়ে যায়, সমাজের কাছে তারও যেন জবাবদিহি করার কিছু থাকে। ওদের নীরব চাহনিতে সেই কৈফিয়তের দাবীই দেখছে নিমাই।

তাই বের হয়নি আর ঘর থেকে।

মদ গিলে চলেছে। হঠাৎ দরজায় নক্ করার শব্দ শুনে চাইলো। মদের নেশাটা গোলাবী আমেজ এনেছে। চমকে ওঠে নিমাই।

বোধহয় সীমা ফিরেছে।

খুশিই হয় নিমাই সীমার দেহটার কথা ভেবে। ওটা তার কাছে ভোগের সম্পদ।

নিমাই তবু স্বামিত্বের শাসন করতে ছাড়বে না। সীমাকেও কৈফিয়ত দিতে হবে। তার এই অবাধ্যতার সাহসটাকে গুঁড়িয়ে দেবে আজ নিমাই।

দরজায় আবার নক্ করার শব্দ উঠতে নিমাই ভরাটি গলায় বলে—যাচ্ছি।

পোজ নিয়ে সে দরজাটা খুলে সীমাকে শাসনই করবে, কিন্তু থমকে যায়। সীমা নয়। সে আসেনি। এসেছে ধড়াচূড়াপরা থানার গোঁফ-ওয়ালা বিরাট দেহ নিয়ে সেই পুলিশ অফিসারটি।

—আপনি! অবাক হয় নিমাই ওকে দেখে।

সান্ন্যালমশাই ঘুঘু ব্যক্তি। এতকাল পুলিশের চাকরী করে অন্ধকারে মোচড় দেবার পথটা খুব ভালোভাবেই চিনেছে। ঘরে ঢুকে নিমাইকে ওইভাবে মদের আসর বসাতে দেখে কঠিন স্বরে বলে,

—এলাম। আসতে হ'ল। তা দেখছি বেশ তো মদের আসর বসিয়েছেন মশাই, বলি, একা না অন্য কেউ আছে-টাছে?

সান্ন্যালমশাই সন্দেহের চাহনিতে এদিক ওদিক চাইছে।

নিমাই একটু ঘাবড়ে গেছে, আর চটেও উঠেছে। শুধোয় সে,

—আপনি এখানে কেন?

সান্ন্যালমশাই চেয়ারে বসে গম্ভীরভাবে বলে,

—প্রয়োজন আছে। থানায় চলুন।

—মানে? অবাক হয় নিমাই ঘোষ।

সান্ন্যাল বলে—মানেটা বুঝতে পারবেন। ওসব মিছে কথা বলে এসেছেন। মেয়েটিকে আপনি চিনতেন। দীঘায় এনেছিলেন ফুর্তি করতে, তারপর যা করার করে-টরে—প্রমাণ লোপ করার জন্য তাকে মার্ডার করে সমুদ্রে ফেলে দেন।

চীৎকার করে প্রতিবাদ করে নিমাই—মিথ্যে কথা। আমি ওকে চিনি না।

সান্ন্যাল শুধোয়—চেনেন না? তাহলে আপনার স্ত্রী যাকে বলেন তিনি কোথায়?

নিমাই ঘাবড়ে গেছে।

মদের নেশাটা কেমন ফিকে হয়ে আসছে। সান্ন্যাল চেনে কোন্ দুর্বল মুহূর্তে চরম আঘাত দিতে হবে। সান্ন্যাল বলে,

—কই জবাব দেন কোথায় পাচার করেছেন তাকে?

নিমাই বলে—বিশ্বাস করুন, তিনি চলে গেছেন কলকাতায়।

হাসে সান্ন্যাল। বলে সে এবার সমবেদনার স্বরে,

—আমি বিশ্বাস করলে কি হবে? পুলিশের আইন তো বিশ্বাস করবে না। চলুন থানায়, সদরে পাঠাবো। সেখানে গিয়ে বিশ্বাস করাবেন কোর্টকে।

নিমাই এবার বিপদে পড়েছে। এত টাকা গেল—সীমার খবরও জানে না, এদিকে তাকে এবার হাজতে যেতে হবে। আদালতে মামলা উঠলে কেলেঙ্কারীর আর বাকী থাকবে না।

নিমাই ব্যবসাদার লোক। টাকার অভাব তার নেই।

তবু বলে সে—এসব মিথ্যা কেসে জড়াচ্ছেন আমায়।

সান্ন্যাল বলে—জড়াতে চাইনা মশাই। কিন্তু আমি কি করবো বলুন?

নিমাই এবার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে। বলে সে,

—সবই করতে পারেন স্যার, মিথ্যে এসব সন্দেহ। আর সেই কথাটাই বলবেন। তার জন্য অবশ্য—

নিমাই ঘোষ দুটো হাজার টাকার বাণ্ডিল বের করেছে। সান্ন্যাল দেখছে টাকার অঙ্কটা। ওতে ঠিক খুশি নয় সে। বেশ বুঝেছে চারে মাছ এসেছে। পাকা রুই এখন খেলিয়ে তুলতে হবে।

সান্ন্যাল বলে—ওসব কি করছেন? অ্যা। টাকার জোরে পার পেয়ে যাবেন আমার হাত থেকে? চলুন—

নিমাই এবার পুরোপুরি পাঁচ হাজার টাকাই বের করে বলে,

—এর বেশি নেই। বিশ্বাস করুন। অনেক লোসকান দিয়েছি মাছের কারবারে। মিসেস্‌ও চলে গেছেন তাই রাগ করে।

সান্ন্যাল চতুর ব্যক্তি—জানে কোথায় থামতে হবে। টাকার বাণ্ডিলগুলো এবার নীচের পকেটে চালান করে বলে,

—ঠিক আছে। তবে কালই ভোরে চলে যান এখান থেকে। এখানে কাল দেখলে বিপদ হবে।

নিমাই ঘোষও বুঝেছে ওষুধ ধরেছে।

সে বলে—তাই চলে যাচ্ছি স্যার, কাল ভোরেই।

সান্ন্যাল শোনায়—আটঘাট বেঁধে তবে তো আসবেন মশায়! এসব গ্যাস্টি কাজ করে সমাজটাকে অধঃপাতে দিলেন আপনারা। তাহলে চলি—

হঠাৎ ফিরে টেবিলের উপর স্বচের একটা বোতল দেখে বলে,

—এসব দ্রব্য এখানে কোথায় পেলেন? ইললিগ্যাল মাল।

নিমাই ঘোষ বুঝেছে ব্যাপারটা। এসব কাজে সে অভ্যস্ত।

এই বেআইনি ঘোষিত মদের বোতলটা তুলে নিয়ে বলে,

—এটাও নিয়ে যান।

সান্ন্যালের গোলমুখে হাসির আভা জাগে। বলে ওঠে সে,

—থ্যাঙ্কু। তাহলে কাল ভোরেই চলে যাবেন কিন্তু। আমি সামলে গেলাম, কিন্তু ফার্স্ট অফিসার দারুণ লোক, ওর হাতে পড়লে বিপদ হবে। গুডনাইট!

সান্ন্যালমশাই বের হয়ে গেল। তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে নিমাই ঘোষ।

দীঘায় আসাটা তার ঝকমারি হয়েছিল এখন সেটা বুঝতে পারে। সীমা নেই। তার জন্য এতবড় বিপদে পড়বে সে ভাবেনি। সবাই যেন তার সঙ্গে শত্রুতা করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। কাল ভোরেই চলে যাবে সে এখান থেকে।

…বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে

সমর হোটেলে ছিল না। বের হয়েছিল দীঘার ওদিকের গ্রামে তার এক বন্ধুর বাড়িতে। আপিসে একসঙ্গে কাজ করে তারা।

সেখান থেকে সোজা গেছে কটেজের দিকে। তখন দীঘায় সন্ধ্যার বাতি জ্বলছে বাজারে।

ভবতারিণী একা যেন বিপদে পড়েছে। দুপুরের পরই খবর পাঠিয়েছিল সেই কিশোরীকে দিয়ে, তখনও ফিরে আসেনি সমর। মিনতি চুপচাপ শুয়ে আছে।

ভবতারিণী ওখানের পুরোনো মন্দিরটাকে নিজেই আবিষ্কার করেছে।

শহরের পেছনে এখানে পুরোনো গ্রাম কিছু আছে। সেই গ্রামের মুখে -বালিয়াড়ির ধারে এক বৃদ্ধ বটগাছের নীচে বহুকালের পুরোনো মন্দির। সামনে প্রশস্ত নাটমন্দিরও আছে।

আজ সেখানে নবদ্বীপের কোন প্রসিদ্ধ কীর্তনিয়ার কীর্তন হবে, তাই ভবতারিণীর যাবার বাসনা।

এদিকে মিনতিকে চুপচাপ শুয়ে থাকতে দেখে বলে,

—কি রে, সমর তো এল না, তাহলে একটা রিক্সা নিয়ে চলে যাবো ? এতবড় নামকরা লোকের কীর্তনগান হবে, ভাবছিলাম যাবো।

মিনতি একটু রুক্ষস্বরে বলে,

—পরের উপর ভরসা না করলে তোমার হয়না ? যাবে তো রিক্সা নিয়ে চলে যাও, কাছেই তো।

ভবতারিণী যেতে চায়। তবু ভয়-ভয় করে।

—একা থাকবি !

মিনতি বলে—কেন ? এত ভয় কিসের !

ভবতারিণী বলে—যা জায়গা বাছা ! কাল রাতে কি হয়ে গেল !

মিনতি শোনায়—যাও তো। আমি দরজা দিয়ে থাকবো। দেরী কোরো না, তাহলেই হবে।

ভবতারিণী বলে—তাই কর। দেরী হবে না আমার।

সে তৈরী হতে থাকে।

ভবতারিণীও সমর না আসাতে অবাক হয়েছে। এমনিতে প্রায়ই আসে। আজ খবর দেওয়ার পরও আসেনি সমর।

ভবতারিণী শুধোয়,

—হ্যাঁরে, সমর এলনা। তুই কিছু বলেছিলি নাকি ওকে ?

মিনতি চাইল মায়ের দিকে। মা যেন কি ভাবছে। মিনতিও সমর না আসাতে ক্ষুব্ধ হয়েছে। আর মায়ের কথায় মনে হয়, মা যেন কি বলতে চায়।

মিনতি বলে—হ্যাঁ। আমি তো ঝগড়াটে, লোকের সঙ্গে ঝগড়া করি শুধু। কে এল-না-এল তার খুশি। তাকে কিছু বলতে যাবো কেন ?

· ভবতারিণী একটু চুপ করে যায়।

আজকাল ছেলেমেয়েদের ব্যাপার সে ঠিক বোঝে না। কেমন ভয়ই হয় তার। বলে সে—না, তা বলিনি। এলনা ছেলেটা তাই ভাবছি।

মিনতি বলে—এতকাল আমাদের একাই কেটেছে, কাউকে লাগেনি, এখনও তেমনিই চলবে, মা। ওসব ভেবোনা। যেখানে যাচ্ছো, যাও।

ভবতারিণী বের হয়ে বলে,

—দরজাটা বন্ধ করে দে।

মিনতি একাই বসে আছে। শুতেও ভালো লাগে না। আজ বোধ হয় পূর্ণিমার কাছাকাছি কোন তিথি। সামনের ঝাউবন কাঁপে হাওয়ায়, চাঁদেব আলো পড়েছে ঝাউবনে। পথে সমুদ্রের ধারে ভ্রমণার্থীদের কলরব কোলাহল শোনা যায়।

প্রকৃতি যেন সর্বংসহা। সবই সে এমনি দ্রুত ভুলে যায়। কাল রাতে এসময় আকাশ-বাতাস জুড়ে ঝড়ের তাণ্ডব চলেছিল—সমুদ্রের ঢেউগুলো যেন লাফিয়ে এসেছিল দীঘার জনবসতকে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করতে। লোকগুলো লুকিয়েছিল আশ্রয়ে প্রাণভয়ে।

ওই সমুদ্রের ক্ষুধা কাল একটি মেয়ের সর্বনাশ করেছে। আজ আবার বদলে গেছে এই প্রকৃতির রূপ।

হাসি আনন্দ আবার ফিরে এসেছে সর্বনাশ, ধ্বংস আর শোকের স্তব্ধতাকে দূর করে। মিনতি জানলা দিয়ে চেয়ে থাকে। দেখছে ওই আনন্দমুখর জীবনকে।

তার জীবনে শূন্যতা ছায়াটাই বড় হয়ে আছে। দু'দিনের জন্য স্বপ্ন দেখেছিল সে। কিন্তু তার কাছে সত্যিকার কোন আশ্বাসই নেই।

দরজার কড়াটা নড়ছে।

মা ফিরে এসেছে বোধ হয়। মিনতি উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে একটু অবাক হয়।

—তুমি!

সমর বলে—বৈকালে আপিসের এক বন্ধু জোর করে তার বাড়িতে

নিয়ে গেল সেই রামনগরে। ফিরতে দেরী হয়ে গেল।

মিনতি বলে গম্ভীর ভাবে,

—কৈফিয়ত চাইনি।

সমর দেখছে মিনতির থমথমে মুখটাকে। সমর বুঝেছে হয় রাগ না-হয় অভিমানই হয়েছে তার সারাদিন না আসায়।

সমর শুধোয়—মাসীমা কোথায় ?

মিনতি বলে—মা কীর্তন শুনতে গেছে কোন মন্দিরে।

সমর কি ভাবছে। হয়তো একা ঘরে মিনতি সংকোচ বোধ করছে।

সমর বলে,

—তাহলে চলি।

মিনতি চা করছিল। জনতা জ্বলছে। সে ফস্ করে কেটলিটা নামিয়ে ফুঁ দিয়ে স্টোভটা নিভিয়ে বলে,

—মাসীমার কাছে এসে থাকলে, যাবে বৈকি। আমি কি বলবো ?

সমর ওর এই রাগের প্রকাশ দেখে এবার হেসে ফেলে। বলে,

—উঃ, এতখানি পথ বাসে ঝুলতে ঝুলতে এলাম। একটু চাও দেবে না, বলে কিনা এসো। জানি তুমি এমনি অভ্যর্থনা করবে। তাইতো মাসীমাকে খুঁজছিলাম। ঠিক আছে। চলি। বাইরে কোথাও চা খেয়ে নিয়ে সমুদ্রের ধারে বসে বসে ঢেউ গুনবো।

মিনতি দেখছে ওকে।

মুখের হাসিটাকে চেপে বলে—থাক্। এই হিমে সমুদ্রের ধারে বসে ঢেউ গুনে কাজ নেই। ঠাণ্ডা লেগে জ্বরে পড়লে তখন দৌড়তে হবে আমাদেরই। বোসো। চা করছি।

সমর যুৎ করে খাটে বসেছে এবার।

বলে সে—অ্যাই রাগ করেছো ?

মিনতি মুখ বুজে চা করছে, স্টোভের নীলাভ জ্যোতির একটু আভা পড়েছে ওর মুখে। ফর্সা নিটোল গাল। টসটসে হয়ে ওঠে ডাগর কালো চোখে নীরব ঝড়ের সংকেত।

—অ্যাই—

কাছে এসেছে সমর। মিনতির কোন সাড়া নেই।

সমর অবাক হয়, হঠাৎ মিনতির চোখে জল দেখে। সমরের সারা দেহমনে কি ব্যাকুল আর্তি জাগে! জানে না সে—মিনতিকে কাছে টেনে নিয়েছে।

কোন প্রতিবাদ নেই মিনতির। প্রতিবাদের সাধ্য তার নেই। ওই নিবিড় স্পর্শ মিনতির সারা মনে ঝড় তুলেছে।

সমরের বুকে মাথা রেখে সে অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ে। সমর আরও কাছে টেনে নেয় তাকে।

—অ্যাই! মিনু—

মিনতি কান্নাভিজে স্বরে বলে,

—তুমি আসোনি, জানি এড়িয়ে থাকতে চাও। তাই যদি হয় কেন আসো? না—না—তুমি এসোনা!

—অ্যাই পাগল! তাই বলছি নাকি?

সমর ভাবতে পারেনি এইখানে একটি মনে তার জন্য এত ব্যাকুলতা আকুলতা জমেছিল। তার নিঃসঙ্গ শূন্য জীবনে এ যেন অনেক প্রতীক্ষার পর অনেক পাওয়া।

এই সম্পদ, এই সম্বলটকু তার শূন্য জীবন-মনকে কি পূর্ণতায় ভরে দিয়েছে!

মিনতিও অশ্রুজলে তার মনের সব জ্বালা ধুয়ে মুছে নোতুন করে আজ ফিরে পেয়েছে তার সবকিছু। মনের অতলের এই স্বপ্নের সন্ধান পেয়ে আজ খুশি হয়েছে সে। সমরের নিবিড় স্পর্শ, তার উষ্ণ নিশ্বাস মিনতির ঘুমন্ত মনে আজ নোতুন এক ঝড় তুলেছে। সেও হারিয়ে যেতে চায় সেই ঝড়ের মাতনে।

হঠাৎ কিসের শব্দে চাইল ওরা।

ভরতারিণী বাড়ি ফিরেছে সকাল-সকালই। দরজাটা ভেজানো। সে বাড়িতে ঢুকেছে। ঘরের মধ্যে হঠাৎ মিনতি আর সমরকে এই অবস্থায় দেখে চমকে ওঠে।

সরে যাবার চেষ্টা করতে, পায়ে একটা কাপ লেগে ছিটকে পড়েছে। সেই শব্দে ওরা চাইতে, মাকে দেখে মিনতি লজ্জায় শিউরে উঠে ওপাশের ঘরে চলে গেল। সমর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অজানা লজ্জায় ভয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে সে।

স্টোভে কেটলির জলটা শোঁ শোঁ শব্দে ফুটছে।

ভবতারিণী চুপ করে কেটলির জলটা নামালো।

স্তব্ধতা নামে সারা বাড়িতে। ভবতারিণীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে অপরাধীর মতো সমর। মিনতির দেখা নেই।

—বোসো। ভবতারিণী বলে ওকে সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে।

নীরবে চা করে ভবতারিণী ওকে দেয়, যেন কিছুই হয়নি।

সমর আজ মনস্থির করে ফেলেছে। তারও করার কিছু আছে। জানে, মিনতি লজ্জায় মায়ের সামনে থেকে সরে গেছে। এই লজ্জা থেকে ওকে বাঁচাবার দায়িত্ব সমরেরই। সব দিক ভেবে সমরও আজ সিদ্ধান্ত নিতে চায়।

বলে সে—একটা কথা বলতাম—

ভবতারিণী শান্ত স্থির চাহনিতে চাইল। আজ তার বলার যেন কিছুই নেই। ভুল সেইই করেছিল, আর তাই এই অপমানজনক কাণ্ডটা স্বাভাবিক ভাবেই ঘটেছে। ভবতারিণী দেখছে সমরকে।

সমর বলে—যা ঘটে গেছে তার জন্য আমিই দায়ী।

ভবতারিণীর দু'চোখ জলে ভরে আসে। অসহায় সে। তার একমাত্র মেয়ের ইজ্জত রক্ষার সাধ্য তার নেই। সমর যেন সেই সুযোগ নিয়েছে।

সমর বলে—যদি আপনার অমত না থাকে মিনতির সব দায়িত্ব আমি নিতে পারি। আমারও কেউ নেই—মায়ের চেনাজানা আপনি। যদি অনুমতি দিতেন—

চমকে ওঠে ভবতারিণী।

এমনি একটা স্বপ্নই দেখেছিল সে। সমর যে তার সেই স্বপ্ন সার্থক করতে এগিয়ে আসবে তা ভাবেনি।

ভবতারিণীর মুখের সেই কঠিন রেখাগুলো সহজ হয়ে আসে।

সমর বলে —আশা করি মিনুর অমত হবেনা। দুজনে চাকরী করবো, আপনারও অসুবিধে হবে না।

মিনতি লজ্জায় সরে গেছল।

লজ্জায় কলঙ্কের কালো কালিতে ভরে উঠেছে মিনতির মুখ।

হঠাৎ সমরের কথাগুলো শুনে চমকে ওঠে সে।

সমর এভাবে সেই কঠিন সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে আসবে তা ভাবেনি। আজ ওর কথাগুলো মিনতির মনে ঝড তুলেছে। খুশির ঝড়। সমরকে যেন নোতুন করে চিনেছে সে।

ভবতারিণী দেখছে সমরকে।

বলে সে—সত্যি বলছো বাবা?

সমর বলে—হঁ্যা। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন মা!

ভবতারিণী ওকে কাছে টেনে নেয়। ওর ওই 'মা' ডাকটুকু ভবতারিণীর মনে একটা নিবিড় আশ্বাস আনে।

বলে সে—ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন বাবা! ভেবেছিলাম আমার মিনু বোধহয় ভুলই করেছে, দুঃখ পাবে শুধু, কিন্তু দেখছি ভুল সে করেনি। তোমাকে আশীর্বাদ করি বাবা! অসহায় একটি মাকে তুমি চরম অপমানের হাত থেকে বাঁচিয়েছো। একটি মেয়েকে সুন্দর ভাবে বাঁচার পথ দেখিয়েছো। ওরে মিনু! শোন—

মিনতি বাইরে আসতে পারে না। কি আনন্দে তার চোখে জল নামে!

বাদল রায়ের ঘুম ভাঙে সকালেই।

রাতের নেশার ঘোর কাটলেও মাথাটা ভার হয়ে আছে। মুখে কপালের সেই ক্ষতগুলোকে দেখছে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায়।

কপালের ক্ষতটাই একটু গভীর হয়ে আছে।

ক্রমশ মনে করতে পারে সেই ঘটনাগুলো।

রমেনও আসেনি সকালে। বাদল রায় নিজের ঘরেই রয়েছে।

বের হলে, মুখ আর কপালের ক্ষতগুলো নিয়ে দু-একজন প্রশ্ন

করবে। তাই ঘরেই রয়েছে।

মনে হয়, কলকাতায় চলে যাবে।

কিন্তু বাসে যেতে হবে। লোকের নজরে পড়বে।

ভাবছে ফোন করে কলকাতা থেকে গাড়ি আনিয়ে ওতেই চলে যাবে আজ রাতে নাহয় ভোরেই।

রমেনটাও আসেনি। সে থাকলে খড়গপুর থেকেও গাড়ি আনতে পারতো। ব্যাটা হারামজাদা। বেছে বেছে একটা সেকেলে সতী-লক্ষ্মীকে ধরে এনে তাকে বিপদে ফেলে পালিয়েছে নিজের পাওনা বুঝে নিয়ে।

বাদল রায় ফোনটা ধরেছে।

সকালের দিকে কলকাতাকে পেয়ে গেছে।- তার ম্যানেজারই আপিসে ছিল। বাদল রায়কে সে কথা দিয়েছে আজ সন্ধ্যার পরই গাড়ি পৌঁছে যাবে এখানে, যাতে সাহেব কালই কলকাতা পৌঁছে যেতে পারেন।

বাদল রায় কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়। একটা দিন সে কোনভাবে কাটিয়ে ভোরেই চলে যাবে।

দরজায় নক্ করে বেয়ারা ঢুকলো ব্রেকফাস্টের ট্রে নিয়ে। বাদল রায় বিলটা সই করে দিচ্ছে। ক'দিন এখানে রয়েছে বাদল রায়। বেয়ারাটা সাহেবকে চিনেছে। সে বলে,

—দীঘা বীচে কাল ঝড়ে একটি মেয়ে সমুদ্রে মারা গেছে, সাহেব।

—মারা গেছে? বাদল একটু চমকে ওঠে।

বেয়ারা বিলটা নিয়ে বলে—ওই তুফানে সমুদ্রে পড়লে আর বাঁচে সাব্? ঢেউয়ের চোটে পাথরে ছিটকে ফেলে খতম করে দেবে না? ডেডবডিটা পড়েছিল ওই নীচের দিকে ক্যানেলের গেটের সামনে। বহুৎ লোকজন জুটে গেছে, পুলিশও গেছে দেখলাম। বেচারা!

বাদল রায় কি ভাবছে!

বেয়ারা চলে গেছে ঘর বন্ধ করে।

বাদল রায়ের চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই ঝড়ের রাতের দৃশ্যটা।

সেই মেয়েটির নিস্ফল প্রতিরোধের চেষ্টা। বাদল রায় যেন কি উন্মাদনায় মেতে উঠে তার টুঁটি টিপে ধরেছিল, সারা মনে সেই হিংস্র ঝড়ের মাতন। স্তব্ধ হয়ে গেছল মেয়েটা!

দুজনে ধরে তার প্রাণহীন দেহটা সমুদ্রে ফেলেছিল।

…বাদল রায় ঘাবড়ে গেছে।

এমনি পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়নি। কে জানে সেই মেয়েটির দেহই ভেসে উঠেছে, না এ অন্য কোন মেয়ে। বাদল রায় মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে—এ বোধহয় অন্যজনই। আর সেই রমেনের 'মেয়েটা' হলেও বাদল রায় ধরাছোঁয়ার বাইরেই থাকবে। কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই।

আয়নায় দেখছে নিজেকে। কপালের ক্ষতটায় স্টিকিং-প্লাস্টার লাগিয়েছে নিজে। মুখে-গালে দু-চারটে আঁচড়ের দাগ। বাদল রায় ওই চিহ্নগুলোর জন্য ভাবছে। একটা সঙ্গত কারণও বের করবে সে এর।

…দীপক চৌধুরী আনমনে সমুদ্রের ধারে ঘুরছে। হোটেল থেকে পথটা ঝাউবনের মধ্যে দিয়ে এসেছে সমুদ্রের দিকে। এ পথটা অপেক্ষাকৃত নির্জন। হোটেলে যারা যাতায়াত করে তারা বেশির ভাগ সময় সামনের পিচঢালা পথটাই ব্যবহার করে। এদিকে পায়ে-হাঁটা পথ।

হঠাৎ দ্যাখে ঝাউবনের ধারে একটা বেওয়ারিশ লেডিস ছাতা পড়ে আছে। ঝরা ঝাউপাতা—কিছু বালিতে চাপা পড়ে আছে ছাতাটা। মনে হয় ঝড়বৃষ্টির আগেই পড়েছিল সেটা, নাহলে ওইসব চাপা পড়তো না।

দীপক চৌধুরী ছোট লেডিস ছাতাটা তুলে নিয়ে দেখতে থাকে। স্টিল-এর তৈরী ছাতার মাথাটা, সেখানের গায়ে গায়ে, দু'চার জায়গায় বিবর্ণ জমাট রক্তের দাগও রয়েছে। পাতা-টাতা চাপা পড়ার জন্য দাগটা ধুয়ে যায়নি।

সাবধানে রুমালে জড়িয়ে রেখে দীপকবাবু ছাতাটা তার অ্যাটাচির

মধ্যে পুরলো। সামনে দেখা যায় ঝকমকে হোটেলটা। হোটেল—এই লেডিস ছাতা—সেই নিহত মেয়েটি—সব মিলিয়ে তার মনে একটা অদৃশ্য যোগসূত্র যেন ফুটে উঠছে। হয়তো কোন যোগও থাকতে পারে।

সেই মেয়েটিকে এই রেস্তোরাঁতেই দেখেছিল সে সেই রাতে খেতে। সঙ্গে ছিল দুজন। তার মধ্যে একজনের চেহারাটা দালাল শ্রেণীরই। পুলিশের অভিজ্ঞ চোখে ঘটনাটা তখনই প্রশ্ন তুলেছিল।

একজন দালাল। অন্যজনের খবরও নিয়েছিল দীপকবাবু। কলকাতার কোন পয়সাওয়ালা লোক। সস্ত্রীক এসেছিলেন—স্ত্রী ফিরে গেছেন সেদিন স্বামীকে রেখে। তার স্যুট-নাম্বারও জেনেছিল সে।

দীপক চৌধুরী কি ভেবে এগিয়ে চলেছে হোটেলের দিকে।

দরজায় নক্ করার শব্দ শুনে চাইল বাদল রায়।

বোধহয় বেয়ারা ট্রে উঠিয়ে নিতে এসেছে। তাই হাঁক দেয়—কাম ইন্!

দরজা খুলে ঢুকছে দীপকবাবু। —আসতে পারি?

বাদল রায় ওই দীর্ঘদেহী লোকটিকে এর আগেও হোটেলের লাউঞ্জে বারে দেখেছে। কিন্তু তাকে তার ঘরে ঠেলে আসতে দেখে অবাক হয়েছে।

তবু বলে সে—আসুন!

দীপকবাবু চেয়ারে বসে দেখছে বাদল রায়কে।

ওর মুখচোখ হঠাৎ কেমন বিবর্ণ হয়ে গেছে। কপালে কাটার দাগ, মুখে গালেও আচড়ের চিহ্ন। দীপক চৌধুরীর মনে হয় ওই ক্ষতের সঙ্গে ছাতার কোন সম্বন্ধ আছে কিনা।

দীপক বলে—কাল রাতে দীঘার বীচে একটি মেয়ের ডেডবডি পাওয়া গেছে। মেয়েটিকে আপনার গেস্ট হয়ে সেদিন রেস্তোরাঁয় খেতে দেখেছিলাম, তাই ভাবলাম, কোন খবর যদি দিতে পারেন।

বাদল রায় মনের ঝড়টাকে চেপে নিজের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে নিছক ভালোমানুষের মতো বলে—তাই নাকি! কোন্

মেয়েটি ? ও হ্যাঁ। হ্যাঁ—পরশু রাতে দেখেছিলেন তো ?

দীপকবাবু ঘাড় নাড়ে—হ্যাঁ।

বাদল রায় বলে—আর বলবেন না! কলকাতায় কিছু ব্যবসাপত্র কারখানা আমাদের আছে। এখানে এসেছি খবর পেয়ে, একটি ছেলে তার বোনকে নিয়ে এসেছিল চাকরীর খোঁজে। ঠিক চিনিও না—অমন তো অনেক উমেদার আসে! খাবার সময় এল, চাকরী দিতে না পারি, একটু খাইয়ে দিয়েছিলাম মাত্র। তাদের নাম ঠিকানাও রাখিনি, রাখা সম্ভব নয়। দেখে মনে হয়েছিল খুবই নিডি, কিন্তু কি করতে পারি বলুন ? সে বেচারা মারা গেল ? ভেরি স্যাড।

বাদল রায় নিপুণ ভাবে অভিনয় করে চলেছে। দীপক চৌধুরীও বুঝেছে ব্যাপারটা। হতাশ হয়ে ওঠার জন্য তৈরী হয়েছে। বলে,

—চলি বাদলবাবু!

বাদল রায়ও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে! হঠাৎ দীপকবাবু দরজার কাছে এসে বলে—টয়লেট কোন্ দিকে ?

বাদল রায় বলে—বাঁ-হাতেই। একটু সাবধানে যাবেন। যা পিছল করে রেখেছিল—ঠিক পরিষ্কার করেনি, পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছি দেখছেন!

দীপকবাবু টয়লেটে ঢুকে দরজা বন্ধ করে এদিক ওদিকে খুঁজছে। একটা প্লাস্টিক বাস্কেটে পড়ে আছে বাদল রায়ের কপালের ক্ষতের রক্তমোছা কিছু তুলো। সেগুলো একটা টয়লেট-পেপারে যত্ন করে জড়িয়ে পকেটে পুরে, হাত মুখ ধুয়ে বের হয়ে আসে দীপকবাবু।

এখন যেন অন্য মানুষ সে।

বাদল রায়কে বলে—এভাবে এসে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত মিঃ রায়। কি করবো বলুন ? ডিউটি। তবু বেচারার খোঁজ পেলে বাড়িতে খবর পেতো। এভাবে অজানা অচেনা মৃত্যু খুবই দুঃখের!

বাদল রায়ও সায় দেয়—সত্যি! সমাজের রূপটাই বদলে যাচ্ছে মশাই। নমস্কার!

দীপক চৌধুরী বের হয়ে যেতে নিশ্চিন্ত হয় বাদল রায়। দারুণ

জবাব দিয়েছে ব্যাটা টিকটিকিকে! এখানে ঠেলে আসবে ওটা, তা ভাবেনি।

হোটেলের ওদিকে রাখা জিপে এসে দীপকবাবু মিঃ সান্যালকে বলে—হোটেলের স্যুট-নাম্বার তিনশো বাইশের উপর নজর রাখবেন। ওখানের কাস্টমার মিঃ রায় যেন বের হয়ে চলে না যেতে পারেন। আমি একটু পরেই ফিরছি। দরকার হলে প্লেন ড্রেসেও কাউকে পাঠাচ্ছি ওয়াচ করার জন্যও—

দীপকবাবু সব ব্যবস্থা করে জিপ নিয়ে এস.ডি.এম.ও.-র হাসপাতালের দিকে দৌড়লো। বেশ কিছুটা দূর। তার মনে একটা সন্দেহ হয়েছে, ওই লেডিস ছাতার বাঁটের রক্ত আর বাদল রায়ের তুলোর রক্ত কি একই, এটা দেখা দরকার।

মেয়েটির স্যুটকেশের মালপত্রও দেখতে হবে, হয়তো একটা যোগসূত্র মিলতে পারে।

সমরের কাছে আজকের দিনটা কি খুশির দিনই!

সকালে হোটেলের বিছানা ছেড়ে উঠে বের হয়েছে মিনতিদের ওখানে। আজ আর কোন সংকোচ নেই। সে ওদেরই একজন হয়ে গেছে।

ভবতারিণীও সকালে সমরকে আসতে দেখে খুশি হয়।

—এসো বাবা। ওসব কি আনলে?

সমর বলে—গরম গরম সিঙাড়া আর জিলাবী ভাজছিল, আনলাম।

ভবতারিণীর সকালে ঠাকুরনাম করার অভ্যাস। বলে সে,

—বোসো বাবা। চা-টা খাও। আমি জপ সেরে আসছি।

মিনতি চা করছিল, সমরের দিকে চেয়ে বলে,

—রাতে ঘুম হয়েছিল তো?

সমর বলে ওঠে—উঁহুঁ! এতবড় খুশির খবরের পর ঘুমই এলনা।

হাসে মিনতি—খুশিতে না ভয়ে ?

—কেন ? ভয় কিসের ?—শুধোয় সমর।

মিনতি বলে—বিয়ে-করা মানেই তো অনেক দায়িত্ব, বন্ধনকে মেনে নেওয়া।

সমর বলে—তবু মন সেটা চায়, মিনু !

মিনতি দেখছে ওকে। সকালের প্রথম আলোয় আজ নোতুন করে দুজন দুজনকে দেখছে। মিনতি বলে—চা খাও ! চা যে জুড়িয়ে গেল।

ভবতারিণীও এসে বসে—কই, চা দে। সমর, এখানেই খাবে দুপুরে।

সমরও খুশি ! বলে সে—বাজার যেতে হবে তো ? চলো—

…এমন সময় এসে হাজির হয় কিশোরী তার মাকে নিয়ে।

গ্রামের মেয়ে। তার স্বামী সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে আর ফেরেনি। ছেলেটাও সমুদ্রে যাক, মা তা চায না। সেদিন মরণের মুখ থেকে ফিরে এসেছে ছেলেটা।

তাই কিশোরীর মাও কলকাতায় ছেলের চাকরী হবে শুনে এসেছে দেখা করতে।

ভবতারিণীও খুশি হয়। বলে সে,

—সংসারে আমি, মেয়ে, আর জামাই হবে। তিনটি প্রাণী বাছা। কি আর কাজ-কম্মো !

কিশোরীর মা সকালে সিঙাড়া জিলাবী চা পেয়েছে। গিন্নীকেও ভালো লেগেছে তার। বলে মেয়েটি,

—ও সব পারবে মা ' তবু কলকাতায় যাক্ কিশোরী। ওই সর্বনাশা সমুদ্র আমার সব নিয়েছে। ওই শেষ সম্বল ছেলেকে গাং-এ পাঠাবো না আর।

ভবতারিণী বলে—পরশু সকালের বাসে আমরা কলকাতা যাবো, কালই সকালে ওকে জামা কাপড় দু'একটা নিয়ে আসতে বলো। কাল সকালে খাবে-দাবে, গোছগাছ করবে। রাতে এখানে থেকে ভোরের বাসেই যাবে আমাদের সঙ্গে।

মিনতিও খুশি হয়েছে। এবার তারা ঘর বাঁধবে। সমর আর তার দুজনের রোজগারে সুন্দরভাবে ছোট্ট বাসাকে সাজাবে। কিশোরীই কাজকর্ম দেখবে। মাও শান্তি পাবে। মিনতি বলে,

—কি রে কিশোরী, থাকবি খাবি, জামাপ্যান্ট জুতো সবই পাবি। আর মাসে মাকে চল্লিশ টাকা করে পাঠাতে পারবি এখন। কাজ শিখলে আরও বেশি পাবি।

কিশোরীর মা বলে—তাই দিও দিদি। তবু ছেলেটা বাঁচুক।

কিশোরী সায় দেয়—যাবো বলছি তো। কাল সকালেই আসবো।

কিশোরীর মায়ের হাতে তবু নিশ্চিন্ত হবার জন্যে ভবতারিণী কুড়িটা টাকাই দেয় আগাম হিসেবে। কিশোরীর মা ধর্মভীরু, বলে সে,

—কিশোরী, মা টাকা দিলেন, যেতে হবে কিন্তু তোকে।

কিশোরী বলে—যাবো বৈকি। গে, প্যান জামা-কাপড় ক্ষারে কেচে, এডি হয়ে কাল সকালেই হাজির হবো। ওই সমুদ্দে? উরি বাপ্ —জোর বাঁচা বেঁচেছি! আর ওমুখো হবো নাইক। রাতভোর পড়েছিনু দরিয়ার তুফানে, আবার!

কিশোরী সেই সমুদ্রে আর যেতে চায় না!

সহরের কোলাহলেই যাবে এবার। সেই কথা দিয়েই গেল কিশোরী রেডী হতে।

ভবতারিণী বলে—ছেলেটাকে পেলে ভালোই হবে, বাবা। মিনু তুই ওর একখানা আগাম টিকিটও করবি বাসে একসঙ্গে। যা ফেরার ভিড়, আগে টিকিট না কবলে পাবি না।

মিনতিদের ফেরার দিন আসছে। ক'দিন দীঘায় এসেছে, মনে হয় শান্তিতেই ছিল। মিনতি বলে—পরশুই ফিরতে হবে?

ভবতারিণী শোনায়—গিয়ে আবার অনেক কাজ রে। শুভদিন দেখে শুভকাজটা চুকিয়ে ফেলতে হবে। বিয়ে বলে কথা!

চুপ করে যায় মিনতি।

…সমর আর সে চলেছে বাজারের দিকে। সকালের সোনা রোদ ঝাউবনে গেরুয়া আভাস এনেছে। লোকজন বের হয়েছে পথে। আসছে নোতুন যাত্রীদল। দীঘা যেন চিরযৌবনা, একজায়গায় তার বয়স এসে থেমে গেছে ওই কালরূপী সমুদ্রের মতো। প্রতিদিনের নোতুন ভ্রমণার্থীর কাছে সে চির-নোতুন। একই মোহময়ী রূপে সে মানুষের মন ভোলায় প্রতিদিন।

সমর বলে—বাজারে কি কি নিতে হবে?

মিনতি হাসে—খুব যে সংসারে আঠা দেখছি? এরপর এটা থাকলে বাঁচি!

সমর বলে—খেলাঘরের সংসার যে সত্যিকার সংসারে পরিণত হবে তা বুঝিনি।

মিনতি প্রশ্ন করে—তুঃখ হচ্ছে নাকি, এখনও পিছোবার পথ আছে।

সমর বলে—ছিল। কাল সন্ধ্যায় কি যে হলো! হঠাৎ ভাবলাম তোমাকে ছেড়ে বাঁচা যাবেনা মিনু! তাই মায়ের কাছে কথাটা বলেছিলাম।

—আরে, শোনেন!—শোনেন!

হঠাৎ কার ডাকে চাইল সমর। সেই বাসের দেখা হরিপদ সরকার রিক্সায় মালপত্র তুলে চলেছে বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে কত্তা-গিন্নীতে। ওদের দেখে ডাকছে।

মিনতি দেখছে ওর গিন্নীকে। যে শূন্যতা নিয়ে এসেছিল মেয়েটি, সেই শূন্যতা তার নেই। মণিমালার মুখচোখে কি তৃপ্তির আবেশ!

মিনতি শুধোয় —ফিরছেন বুঝি?

ঘাড় নাড়ে মণিমালা।

হরিপদ সরকার ক'দিনেই দীঘার বিচিত্র পরিবেশে অনেক কিছুই দেখেছে। তার জীবনের পরিবর্তনটাকেও। খুশিই হয়েছে সে। তবু তুঃখ হয় সেই মেয়েটির জন্য। বেচারা সমুদ্রে এসে নিজেকে শেষ করে গেল। সেই ঘাটের ছেলেটিকেও আর ছাখেনি।

আজও সমর আর মিনতিকে একসঙ্গে দেখে হরিপদ সরকারের মনে কঠিন প্রশ্নটা জেগেছে। তাই বলে সে সমরকে,

—খুব তো একসঙ্গে দেহি তুটিকে। একডা মাইয়াও প্রেম কইরা ডুইবা মরছে। ভদ্দর লোকের ছাওয়াল দেহি ওটারেও কি অমনি কইরা মারবেন মুশয় ?

সমর চটে ওঠে ওর কথায়—কি বলছেন ?

সরকার বলে—ঠিকই কইছি। আজকালকার পোলাপানদের বাঁদরামিই দেহি। লষ্টামি করতি আসে এহানে—

সমর বলে—কে কি করে জানিনা। আমরা বিয়ে করছি। সব ঠিকই হয়ে গেছে। এসব কথা কেন উঠছে ?

হরিপদ সরকারের কঠিন মুখটা নরম হয়ে ওঠে। দু'চোখের তারায় বিচিত্র হাসির আভা জাগে। খুশি হয়েছে সে।

—সত্যি কইছেন ?

মণিমালা ও-কথাটা জেনেছে। খুশিভরে বলে সে,

—এদের বিয়ে হচ্ছে। কলকাতার শ্যামবাজারে থাকে আমাদের ওদিকেই। যেতে বলেছে আমাদেরও।

হরিপদ সরকার খুশিভরে বলে,

—উত্তম কথা। যামু—নিশ্চযই যামু বিহাতে। আরে ব্রাদার, লুকে বলে হরিপদ সরকার খচ্চড়। ভালো কতা কইলিই খচ্চড় হতি হয়। তা ভায়া ? সমর নামটা বলে।

হরিপদ সরকার ফতুয়ার পকেট থেকে তার দোকান, বাড়ির ঠিকানা আর ফোন নাম্বার লেখা কার্ডটা দিয়ে বলে,

—আইবা ভাইটি! তুমাদের বিহাতে যামু। দুজনেই যামু। কি গো ?

মণিমালাও সায় দেয়।

হরিপদ সরকার বলে—জীবনে ঠকাইও না ভাইডি! নিজে ঠক্‌বানা। সুখী হইবা। জয় গুরুদেব !

পকেট থেকে কালো কার বাঁধা ঘড়িটা বের করে বলে,

—বাসের টাইম হইছে। যাই, ভাইটি। কলকাতা যাই ফোন করবা কিন্তু। চলো—

ওরা চলে গেল।

মিনতি আর সমর তখন দাড়িয়ে আছে। সমরের মনে হয়, ভুল সে করেনি। মিনতি বলে,

—বেশ ভালো লোক দুজনে।

জীবনের খুশির আবেশ মানুষের মনের সংকীর্ণতার বাধাকে হয়তো দূর করে।

সেটা ঘটেছে দুবিপদ সরকারের জীবনেও।

দীঘার প্রকৃতি—আর সান্নিধ্য ওদের শহরের বিষাক্ত মনের ক্লেদ-টাকে দূর করেছে। আজকের নগর সভ্যতার পাশে তাই হয়তো বাঁচার জন্যই মানুষ নির্জন প্রকৃতির স্পর্শটুকুর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

নিমাই ঘোষ এইখানে দুদিনের জন্য বিশ্রাম নিতে এসেও লোভে পড়ে বাণিজ্য শুরু করেছিল। আর তাতেই সব ডুবে গেছে। পুলিশকে বিদায় করে ভাবছে কথাটা।

রাতের খাবার এনেছে বেয়ারা।

সাহেবের অনেক পয়সাই বকশিশ নিয়েছে সে। তাই খবরটা সে-ই দেয়। বলে সে,

—মেমসাহেবকে রিক্সা নিয়ে সুটকেশ তুলে শঙ্করপুরের আশ্রমে নিয়ে যেতে বলতে শুনেছি সার! কে জানে ওখানে আছেন কিনা!

অবাক হয় নিমাই ঘোষ—শঙ্করপুর আশ্রম!

বেয়ারাই খোঁজ দেয়—মাইল তিনেক হবে ভিতরে। সেখানে বিজনবাবুদের বিরাট স্কুল, তাঁতশালা—আরও কি-সব আছে।

ভোরেই প্রার্থনার সুর ওঠে শান্ত সবুজ আমবাগানে—ফুলবাগানে।

আশ্রমের প্রার্থনা শুরু হয়েছে। সীমা এখানে ক'দিনেই নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। ভালো গান গায়। সুতরাং আশ্রমের প্রার্থনাগানে

তারই নেতৃত্ব এসেছে। ক্লাসেও পড়াচ্ছে।

সীমা ক'দিনেই তার অতীতের গ্লানিময় জীবনকে ভুলে নোতুন জীবনে মিশে গেছে। তার গানের সুর ওঠে, ধ্যানগম্ভীর প্রার্থনার সুর।

নিমাই এই পবিত্র জীবনের ছবিটাকে এই শান্ত পরিবেশে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে। তার অর্থের অভাব নেই। কিন্তু এই জীবনে প্রবেশের পথ তার কাছে অজানা। ওই সমবেত প্রার্থনার বেদীতে লালপাড় সাদা খোলের শাড়িপরা পবিত্র পাবকশিখার মতো মূর্তিময়ী মেয়েটি আজ তার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

সেখানে হাত বাড়াবার সাধ্য নেই নিমাইয়ের।

সে আজ তার সংসার, ভোগের অন্ধকার জগৎ থেকে সবে গিয়ে দূর আকাশের নক্ষত্রে পরিণত হয়েছে।

প্রার্থনা শেষ হয়ে গেছে।

যে যার ঘরে ফিরছে। এরপর শুরু হবে দৈনন্দিন কাজ।

আম গাছে বোল এসেছে, বাতাসে তারই মিষ্টি গন্ধ জাগে। নীচের ঘেঁটুফুলের বনে এসেছে সাদা ফুলের রাশি। মৌমাছিদেব ঘুম ভেঙেছে, তাদের গুঞ্জরনে মিশেছে পাখিদের কলরব।

নির্জনে হঠাৎ সামনে নিমাইকে দেখে চাইল সীমা।

কোন প্রতিবাদ, জ্বালা, বিক্ষোভ নেই ওর চাহনিতে। ত্যাগের শুভ্রমূর্তির সামনে নিমাই আজ থমকে দাঁড়িয়েছে।

নিমাই বলে—তোমার কাছে এসেছিলাম, সীমা!

সীমা বলে—এসে আর লাভ কি? কোন দাবী আমার নেই। কোন নালিশও নেই। তোমার আমার জাবনের পথ দুদিকে বেঁকে গেছে। তাই সব মেনে নিয়েই সরে এসেছি।

নিমাই দেখছে ওকে। কঠিন ঠাঁই, দাবী জানাবারও সাহস তার নেই ওই স্তব্ধ মূতির সামনে। নিজের মনের অপরিসীম দৈন্যটাকে আজ নগ্নরূপে দেখেছে সে। তাই এতবড় আঘাতকে মেনে নিতে চেষ্টা করে নিমাই। তবু বলে,

—একাই ফিরে যাবো?

সীমা বলে—আমিও একাই এপথে পা বাড়িয়েছি। এ ছাড়া পথ ছিল না আমার। সব আমাব মিথ্যা হয়ে গেছে, তাই মিথ্যার জীবনকে ঠেলে সত্যের সন্ধানেই এসেছি। তুমি যাও! আমার কাজ আছে—

ঘণ্টা বাজছে। ক্লাসে চলেছে মেয়েরা। সীমাও এগিয়ে গিয়ে ওদের ভিড়ে মিশে গেল।

ব্যর্থ, শূন্য নিমাই ফিবে এসেছে।

বাসটা ছাড়তে দেবী নেই। মালপত্র তুলছে।

হঠাৎ সেদিনেব বাসে দেখা নিমাইকে চিনেছে তারা। সমব এগিয়ে আসে।

সমব বলে—স্ত্রীকে এনেছিলেন না? একা ফিবছেন? তিনি?

নিমাইয়ের চোখমুখে ঝড়েব চিহ্ন। নিমাই চাপাস্বরে গর্জে ওঠে সমবকে দেখে,

—সব খচ্চব মশাই, বউ-ই বলুন আব যাই বলুন। ফাঁক পেলেই কেটে পড়বে। আমিও নিমাই ঘোষ। কোর্টে যাবো। এমন বউয়ের কাঁথায় আগুন দিয়ে আবাব একটা বিয়ে কববো। সতী! শ্লা—সতীপনা ছুটিয়ে দেব ওই মেয়ে জাতেব!

বাসটা স্টার্ট দিয়েছে। উঠে গেল নিমাই। ওই বাসেব গজনে তার বাকা কথাগুলো শোনা গেল না। তবে সুখশ্রাব্য মন্তব্য সেগুলো যে নয় তা বুঝেছে এবা। বাসটা বেব হয়ে গেল একরাশ পোড়া ডিজেলের কালো ধোঁয়া ছেড়ে।

সমর বলে—ভদ্রলোকের স্ত্রী বোধ হয কেটেছেন!

মিনতি জবাব দেয়—ভদ্রলোক! মাতাল লুচ্চার মতো চেহারা। মদের গন্ধ ভক্ ভক্ করছে। অমন লোকের হাত থেকে সরে গেলে মেয়েরা তবু বাঁচবে! বেশ কবেছে সে।

সমর বলে—ওরে বাব্বা রে! অবশ্য মেয়ে হয়ে মেয়েদের সাপোর্ট তো করবেই।

মিনতি শোনায়—বেলা হয়ে গেছে। বাজারে চলো তো? পথে

পথে আর নাটক দেখতে পারি না।

সমর বাজারের দিকে এগোতে এগোতে বলে—জীবনটাই নাটক। এখানের ছোট্ট রঙ্গমঞ্চে তাই সেই নাটকীয় মুহূর্তগুলো সহজেই চোখে পড়ে, মিনু। আমরাও সেই নাটকের এক একটা চরিত্র।

বাজারে, দোকানে তখনও আলোচনা হয় সেই মেয়েটির মৃত্যুর কথা। ওই মাত্র। পুরোনো লোকদের দু'একজন বলে শুধু। বাকী হাল্‌ফিলের টাটকা আসা যাত্রিদের কাছে ওর কোন দাম নেই। তারা দুদিন এসে শুধু আনন্দ কুড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়

দীপক চৌধুরী সাবডিভিশন্যাল মর্গে এসে রিপোর্টটা পেয়েছে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে মেয়েটিকে মেয়েটির দেহে অত্যাচারের চিহ্নও ছিল সমুদ্রে ডুবে মারা যায়নি। হত্যা করে সমুদ্রে ফেলা হয়েছিল তাকে। আরও বিস্ময়ের খবর যে লেডিজ-ছাতার বাঁটের রক্তের দাগ আর হোটেলের বাদল রায়ের ঘর থেকে সংগৃহীত তুলোয় রক্তের দাগ হুবহু একই গ্রুপের। কোন হেরফের নেই।

খবরটা নিয়ে জিপে করে ফিরে আসছে দীপকবাবু।

এবার সাক্ষ্যপ্রমাণ আরও কিছু পেতে হবে তবে এর জোরেই বাদল রায়কে অ্যারেস্ট করতে পারেন। কিন্তু আরও প্রমাণ চাই।

ক্লু বলতে একটা বোতাম মাত্র, সেটা মৃত মেয়েটির মুঠোয় পাওয়া গেছে।

বৈকাল নেমেছে।

সেই মেঘ-ঝড়ের পর এখানে একটু ঠাণ্ডাও রয়েছে। নোতুন ভ্রমণকারীর দল ভিড় করেছে বীচে। সারাদিন ঘরে বন্ধ থাকার পর বাদল রায়ও বের হয়েছে।

তখন সন্ধ্যা নামছে। কলকাতা থেকে তার গাড়িটাও এসে গেছে।

ড্রাইভারকে বলে মিঃ রায়—খেয়ে-দেয়ে রেস্ট নাও। কাল ভোরেই বের হবো।

বাদল রায়ের চলে যাবার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে।

সকালে পুলিশের লোকটাকে বিদায় করে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে বাদল রায়। সে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। কলকাতা ফিরে গেলে সেখানে তার গায়ে হাত দেওয়া একটু কঠিন হবে পুলিশের। কোন প্রমাণও নেই।

নিশ্চিন্ত মনে বাদল রায় বীচে বেড়াতে বের হয়েছে।

আসছে বাঁধের ওপর দিয়ে, নীলাভ মার্কারি আলো জ্বলে।

—নমস্কার।

থমকে দাঁড়ালো মিঃ রায় দীপক চৌধুরীকে দেখে। বাদল রায় একটু বিরক্ত হয়। তবু প্রতিনমস্কার জানালো সে। দীপক চৌধুরী বলে,

—একটু সময় হোটেলে যেতে হবে আমার সঙ্গে।

এবার মিঃ রায় কড়া মেজাজে বলে—একজন ভদ্রলোককেও শান্তিতে থাকতে দেবেন না? আমি এস. পি.-কে ফোন করছি।

হাসে দীপক চৌধুরী। সে বলে—সেই মেয়েটির ছাতাটা পেয়েছি স্যার. ওই ঝাউবনের ধারে যেটা দিয়ে সে আঘাত করেছিল আপনার মুখে, কপালে।

চমকে ওঠে বাদল রায়—কি বলছেন যা-তা?

একফালি আলো পড়েছে বাদল রায়ের বিবর্ণ মুখে। দীপক চৌধুরীর হঠাৎ নজর পড়ে বাদল রায়ের কোটের উপর।

সুন্দর দামী কোটের বোতামগুলোর একটা নেই।

দীপক চৌধুরী এবার প্রমাণ পেয়েছে। বলেন তিনি,

—তা করতে পাবেন। কিন্তু এই বোতামটা গেল কোথায় মিঃ রায়?

খেয়াল হয় বাদল রায়ের।

কাল রাতে ওটাই পরেছিল। একটা বোতাম সেই ধস্তাধস্তির

সময় ছিঁড়ে গেছে বোধহয়।

মিঃ রায় বলে—খুলে গেছে।

দীপক চৌধুরী বলে—সেটা পাওয়া গেছে সেই মৃত মেয়েটির হাতের মুঠোয়। রয়েছে আপাতত আমাদের এক্‌জিবিটে। সেটাও দেখবেন চলুন।

স্তব্ধ হয়ে যায় বাদল রায়।

ভেবেছিল পার পেয়ে যাবে, কিন্তু এরা যে এভাবে শক্ত জাল পেতে তাকে ধরবে তা ভাবতেই পারেনি মিঃ রায়।

দীপক চৌধুরী পুলিশ নিয়ে হোটেলের স্যুটে এসে তখন বাথ-রুমের বাস্‌কেট থেকে সেই রক্তাক্ত তুলো সিজ করে। সারা হোটেলে সাড়া পড়ে যায়। তাদের সমাজের টাকাওয়ালা মানুষদের একজনের স্বরূপটা এভাবে প্রকাশ পেতে ওরা স্তব্ধ হয়ে গেছে।

সেকেণ্ড অফিসার সান্ন্যালও এসেছে। সে অবাক হয়ে যায় দীপক চৌধুরীর এই কাণ্ড দেখে। এতবড় একজন লোককে আজ জালে ধরেছে দীপকবাবু, সান্ন্যাল তবু খুশি। এই কেসের ভড়কি দেখিয়ে সে অন্যত্র কিছু রোজকার করেছে।

এবার কর্মনিষ্ঠ পুলিশ অফিসার সেজে বলে,

—উঃ, সাংঘাতিক কাণ্ড মিঃ চৌধুরী! সত্যি দারুণ একটা কাজ করেছেন স্যার। সমাজের এই মুখোসটা খোলা দরকার।

তখন রাত্রি নেমেছে দীঘায়।

ভবতারিণীর তাড়া শুরু হয় সকাল থেকেই।

—সকাল-সকাল রান্না করে নিচ্ছি, বাছা। ওবেলায় হোটেলে খেয়ে নিবি। ভোরের বাসেই যাবো। কিশোরী এসে পড়লে ওকে দিয়ে বাসনপত্র মাজিয়ে নিবি দুপুরেই।

মিনতি বলে—এত তাড়া কিসের! যাবো তো কাল সকালে। কিশোরী আসুক।

ভবতারিণী শোনায়—তোর যেন দীঘা থেকে যেতে মন সরছে না। ওদিকে এত কাজ কলকাতায়—

ক'দিনের ছুটিটা ভালোই কেটেছে। সবুজ ঝাউবন, সমুদ্রের জগতে কাজের তাড়া নেই। আবার সেই কাজের মধ্যে ফিরে যেতে হবে।

সমর এসে পড়ে।

বলে সে—যাবার আগে দীঘার লেক ও ওদিকের আশ্রম দেখে আসবো আজই সকালে।

ভবতারিণী বলে—তোরাই যা, বাছা। আমি রান্না সারি।

ততক্ষণে কিশোরীও এসে পড়বে।

মিনতি আর সমর বের হয়েছে।

দূরে দীঘার লেক—কিছু সাইট গড়ে উঠেছে। তার ওদিকে বালিয়াড়ির পাহাড় পেরিয়ে দেখা যায় গ্রাম-সীমা।

রিক্সাওয়ালা বলে—ওইখানে সেই আশ্রম। দেখার জায়গা দিদিমণি!

তার কিছু বেশী ভাড়া আমদানী হবে। তাই বলে সে,

—ইস্কুল, বাগান—একেবারে তপোবন! যাবেন নাকি? যেতে আসতে ঘণ্টাটেক লাগবে।

কি খেয়ালবশে চলেছে তারা!

দিনের আলোয় বিরাট ছায়াঘন বাগান, ওদিকে সবুজ ক্ষেত' সব্জীর চাষ হচ্ছে। পাম্পে জল উঠছে। গাছে গাছে এসেছে আমের বোল। বাগানের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে ফুল আর ফুল!

মিনতি বলে—সত্যিই সুন্দর জায়গা। স্কুল-বোর্ডিং, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল সবই আছে দেখছি।

দুজনে ছায়াঘন বাগানে ওই ফুলের সৌরভ মাখা জগতে এসেছে! বাইরের কোলাহল নেই, ছেলেমেয়েদের পড়ার শব্দ কানে আসে, কোন গাছতলায় গানের ক্লাস বসেছে।

ওদিকে অন্য ক্লাস।

তারা ঘুরছে বাগানে। হঠাৎ একটি মেয়েকে দেখে অবাক হয় মিনতি। গানের ক্লাসে তন্ময় হয়ে গান শেখাচ্ছে সে।

মিনতি বলে—সেই বউটা না? সেই-যে বাসে এসেছিল যে মাতাল ভদ্রলোক—কাল বাসস্টপে যা-তা বলে গেল! সেই মেয়েটিই তো?

সমরও চিনেছে সীমাকে।

আজ ওর পরনে দামী শাড়ি-গহনা নেই। সাদাখোলের লালপাড় শাড়িতে ওকে সুন্দর দেখাচ্ছে, যেন তপস্বিনীর মতোই। মুখেচোখে কি তৃপ্তির আভাষ—তন্ময় হয়ে গাইছে সীমা।

…সীমাও গান শেষ করে উঠেছে।

ঘণ্টা বাজে। হঠাৎ সামনে সমর আর মিনতিকে দেখে অবাক হয়।

এগিয়ে আসে—আপনারা?

মিনতি বলে—আশ্রম দেখতে এসেছিলাম, কিন্তু এখানে আজ এই অবস্থায় আপনাকে দেখবো ভাবিনি।

সীমা চিনেছে ওদের। বলে সে,

—আমিও ভাবিনি, ভাই। কিন্তু হঠাৎ ওই জীবনের চেয়ে অনেক সুন্দর জীবনের পথ পেয়ে এখানেই চলে এসেছি সব-পাওয়ার প্রশ্ন ছেড়ে। আনন্দেই আছি। কোন দুঃখ অভিযোগ নেই। যা পেয়েছি তাতে আমি তৃপ্ত এই সামান্য নিয়েই।

সেই তৃপ্তির আভাষ ওর চোখে-মুখে, কথায়।

মিনতি দেখছে সীমার এই নোতুন রূপকে!

বেলা হয়ে আসছে। ফিরতে হবে তাদের।

মিনতি বলে—চলি ভাই!

ছায়াজগৎ, ফুল-ফোটা পরিবেশ থেকে মিনতি সমর ফিরছে দীঘার বালিয়াড়ির দিকে। মিনতি বলে,

—এবার ভুল ভেঙেছে তো?

সমর চাইল, সেও নিজে দেখেছে ব্যাপারটা। মিনতি বলে,

—মেয়েরা খারাপ হতে চায় না। তাদের কাছে নিজের ইজ্জৎ,

সম্মান-শুচিতা চিরকালের বড় সম্পদ। কিছু লোভী মানুষই তাদের সর্বনাশ করতে চায়। সেই লালসার হাত এড়িয়ে প্রতিবাদ করে কেউ নোতুন পথে বাঁচার চেষ্টা করে, কেউ নিজেকে শেষ করে দিয়ে বেঁচে যায়।

মেয়েদের এ যন্ত্রণা চিরকালের।

আজ সীমাকে দেখে খুশি হয়েছে সমর।

সেই রাতের মৃত মেয়েটির মতো পরাজয়কে সে মেনে নেয়নি। এ নোতুন করে বাঁচাব চেষ্টা করেছে লোভী নিমাইদের মতো মানুষকে অগ্রাহ্য করে, অস্বীকার করে।

মিনতির খেয়াল হয় এতক্ষণে— অ্যাই! কত দেরী হয়ে গেল। মা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বোধহয়।

সমর বলে—মায়ের ভাবার কারণ নেই মিনু। আজ মেয়ের জন্য তার মাথাব্যথা আর নেই। ওটা এখন আমার ঘাড়েই চালান করেছেন।

—ইস্! হাসে মিনতি।

ওরা বাসায় ফিরতে ভবতারিণী বলে—এখনও কিশোরী এলনা সমর!

ভবতারিণীর রান্নাবান্না শেষ পূজাপাঠও। সমর বলে,

—এসে পড়বে ঠিক।

ভবতারিণী তাড়া দেয়— তোমরা খেয়ে-দেয়ে নাও, বাছা। হেঁসেল-পত্র তুলে রাখি, তার মধ্যে সে এসে যায় ভালোই। তারপর গোছগাছ করতে হবে।

সমর আশ্বাস দেয়,

—ও নিয়ে ভাববেন না। এই তো জিনিস—হাতাহাতি গুছিয়ে নোব।

ভবতারিণী নিশ্চিন্ত হয়।

এতকাল ওই কাজটা নিজেকেই করতে হয়েছে। আজ মনে হয়

তার পাশে একজন আছে যার উপর সে ভরসা করতে পারে। তাই বলে সে,

—তাই কোরো বাবা। ছেলেটাও এলনা এখনও। টাকা নিয়ে গেল।

দুপুরে আজ ঘুম আসে না।

সমর মিনতি খাওয়ার পর রোদে পিঠ করে বসে আছে। কিশোরী সেই কাল গেছে আর আসেনি।

ভবতারিণী বলে—সবাই ঠকিয়ে যায়, বাবা। ছেলেটাও ঠকিয়ে গেল। আসবে না, অথচ টাকা নিয়ে গেল।

সমর কি ভাবছে। সে থেকেই টাকাটা দিয়েছিল, তার দায়িত্বও কিছুটা রয়েছে এতে।

সমর বলে -চলো মিনু, ছেলেটার বাড়ি তো কাছেব গ্রামেই। খোঁজ করে দেখে আসি। পালাবে—এমনি?

ভবতারিণী ভীতকণ্ঠে বলে—আবার ঝামেলা হবে না তো? তার চেয়ে যা গেছে যাক।

সমর বলে—না, না। আপনি ভাববেন না। তবু ছেলেটাব খবরও নিয়ে আসা যাবে।

বাসস্ট্যাণ্ডে এসে খবর নিতে, কোন কনডাক্টার বলে—অলংকারপুব তো কাছেই। মিনিট দশ-বারো লাগবে বাসে।

সমর বলে—তাহলে চলো মিনু, ঘুরেই আসি।

গ্রামটা রাস্তার ধারেই।

একদিকে সবুজ গাছগাছালি, সঙ্গতিপন্ন কিছু গৃহস্থেব বাড়ি। খামারে ধান উঠেছে। শীতের শেষ। তখনও বাতাসে খেজুররসের গন্ধ ওঠে। পথে জিজ্ঞাসা করে সমর, কিশোরীর কথা।

এমন খুব চেনা নয় সে। তাই দু'চারজন ঠিক জবাবও দিতে পারে না। একটা ছেলে মাছের ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছিল, সে-ই বলে—কুন্ কিশোরী গো? তেঁতুলে কিশোরী?

কিশোরীর এ পরিচয় জানতো না সমর।

ছেলেটা বলে—ই গাঁয়ের মালোপাড়ায় তিনজন কিশোরী আছে। নিমে কিশোরী, তাঁতি কিশোরী আর আমার মতো মাথায়—গাবু মহাজনের জালে কাজ করে সি তেঁতুলে কিশোরী।

সমর বলে—ওকেই খুঁজছি।

ছেলেটা বলে—আসেন আমার সাথে।

এ পাড়াটা গ্রামের এলাকার বাইরে খানিকটা মজা জলার ধারে।

এদিকের কোন শ্রী-ছাঁদ নেই। নুইয়ে পড়া ভাঙা মাটির বাড়ি. খড়ের ছাউনিও তেমন নেই। বর্ষায় জলে দেওয়াল আঁচিল-পাঁচিল গলে-গলে পড়ছে। নিরাভবণ দারিদ্র্যের নগ্ন প্রকাশ চারিদিকে। মরা গাছের ডালে জাল শুকুচ্ছে। পুরুষ বেশি নেই। দু'চারজন বুড়ো চেয়ে দেখছে তাদের। মেয়েরাই সংখ্যায় বেশি। সবই যেন বিধবা!

মিনতি বলে—এ-যে বিধবার পুরী!

একজন বুড়ো বলে—সব যে দরিয়ায যায় মা। ই শালোদের জন্ম ইস্তক সমুদ্রের নোনা পানি টান দেয়, টানতে টানতে একদিন ফেরার হয়ে যায় দরিয়ায়, আর ফেবে না। তাই পুরুষদের আর পাবা কুথায়?—তা কাকে খুঁজছে বাবুমশায়রা?

এমন সময় মিনতি ওদিকে কিশোরীর মাকে দেখে চাইল।

কিশোরীর মাও এদের দেখে চিনেছে। এগিয়ে আসে সে।

—দিদিমণি! তুমরা এসো! ঘরকে চলো—

ঘর না বলে ভাঙা চালাই বলা যায়।

দাওয়ার খুঁটিগুলোও ভেঙে পড়েছে। আচিল-পাঁচিল নেই। উঠানে দু-একটা ভাঙা পলুই রয়েছে। কিশোরীর মা বলে,

—সে আঁটকুড়োর ব্যাটা সকাল থেকেই পালাইছে দিদিমণি! ঘরে আর ফেরে নাই। তুমার কাছে কথা দে মিথ্যুক হলাম। উটো যাবে নাইক।

কি ভেবে কিশোরীর মা ঘরের ভিতর থেকে দোমড়ানো নোটটা বের করে এনে বলে,

—গরীবের ঘর দিদি, সর্বস্ব প্যাটে পুরেছি। ইটোও পুরে দিয়ে পাতকী হবো? ই তুমি লিয়ে যাও দিদি! সি খালভরাকে কতো খোঁজলাম, পেলাম না।

সমর অবাক হয়।

কিশোরীব মায়ের চোখে জল নামে।

বলে সে—উখানে গেলে বাঁচতো মা—খেয়ে-প'রে। তা উর কপালে অপমি'ত্যু আছে আমি কি কববো বলো?

মিনতি দেখছে সংসারেব নগ্ন অভাবটাকে। বলে সে,

—ওটা তুমি রাখো কিশোরীব মা।

—সে কি গো! কুছুই কবলাম নাই, ট্যাকা দিবে কেনে?

মেয়েটা অবাক হয়েছে।

মিনতি ওই টাকা নিতে পাবে না। বেব হয়ে এল ওই পরিবেশ থেকে।

বাস-রাস্তায় এসে চায়ের দোকানে বসলো ওরা।

বাসেব বিশেষ দেরা নেই। এখান থেকে চলে যেতে পাবলে যেন বাঁচে। অনেক কৌতূহলী চোখের ভিড জমেছে তাদের ঘিবে।

বাস থেকে ওবা দীঘায় নেমেছে তখন বৈকাল হয়ে আসছে।

আজকের বৈকাল তাদেব দীঘায় শেষ বৈকাল। সোনালী ছাযা নেমেছে বালুচবে। নোতুন উৎসাহে বের হয়েছে নোতুন আসা ভ্রমণার্থীর দল। দীঘার বালুচবে তাই আনন্দ-কোলাহল করার লোকের অভাব হয় না। একদল আসে, আবার চলে যায়—আসে উৎসব আর ছুটির মন নিয়ে এখানেব বালুচবে অন্যদল।

আসা-যাওয়ার বিরাম নেই।

মিনতি বলে—কালই তো ফিবে যেতে হবে। চলো, আজকের বৈকালে একটু দেখে আসি বীচের ওদিকটা। আবার কবে আসা হবে কে জানে!

বৈকালের আলোয় দেখা যায়, দূরে বালুচরে ঢোল বাজছে। কিসের পুজো হচ্ছে মহাসমারোহ সহকারে। কিছু লোকজনও জুটেছে। কৌতূহলী দর্শকের দল ভিড় করেছে সেখানে।

সমর-মিনতিও এগিয়ে চলে।

নোতুন নৌকা-পত্র নামাতে হচ্ছে অনেক মাছ-মহাজনকে, কারণ ওই ঝড়ে তুফানে তাদের বেশ কিছু নৌকা, মানুষজন সমুদ্রে হারিয়ে গেছে। অনেক ক্ষতিও হয়েছে তাদের। তবু থেমে থাকার উপায় নেই।

তাই ধার-দেনা করেও মাছ মারতে পাঠাতে হবে—না হলে, এ ক্ষতিরও পূরণ হবে না। তাই মরীয়া হয়ে আবার নোতুন মাছমারা টিম করে তারা বের হচ্ছে সমুদ্রে। এসময় কোটালের মুখ—সমুদ্র দয়া করলে সব ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবে মহাজন। তাই ভক্তিভরে পুজো করে জলে নামবে তারা।

নৌকার মাঝি, মাছমারাদের এদিন নোতুন ধুতি-গামছা-গেঞ্জি দেয় মহাজন। ওরা নোতুন ধুতি-গেঞ্জি পরে কোমরে গামছা জড়িয়ে ঢোল-কাঁসির তালে তালে নেচে পুজো শেষ করেছে। খিচুড়ি প্রসাদ পেয়ে জোয়ারের গোণেই তারা সমুদ্রে যাবে।

রসি-কাছি, খাবার জলের মেটে, মালের স্তূপ, ক'দিনের চাল-ডালের রসদও উঠেছে নৌকায়। এবার যাত্রার শুরু।

…বালুচরে এসেছে অনেক মাছমারাদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা। তারা দেখেছে ক'দিন আগেও সেই মারমুখী সমুদ্রকে। আজও তাদের আপনজনদের আবার সমুদ্রে পাঠাতে বাধ্য হয়েছে তারা পেটের জ্বালায়।

সমর আর মিনতিও হাজির হয়েছে সেখানে।

মহাজনের নৌকা ছাড়বে এইবার। শেষবারের মতো মা-বসুমতীকে প্রণাম করে মাঝিরা উঠছে নৌকায়। লঞ্চের পিছনে বাঁধা হয়েছে নৌবহরকে।

—দিদিমণি!

হঠাৎ কার ডাকে চাইল মিনতি।

ছুটে আসে কিশোরী, পরনে নোতুন ধুতি গেঞ্জি। কোমরে গামছা বাঁধা।

মিনতি শুধোয়—যাসনি কেন রে?

কিশোরীর মুখেচোখে খুশির আভা। ছেলেটা বলে,

—পট্ কত্তার জালে যাচ্ছি গো দিদিমণি! নোতুন কাপড় গেঞ্জি দেছে। আবার দরিয়ায় যাবো গো।

অবাক হয় সমর—আবার সমুদ্রে যাবি? সেদিন মরতে মরতে বেঁচে এলি যে রে?

হাসে কিশোরী—মরণ তো বাবু সবখানেই গো। আমাদের গাঁয়ের হলাকাকা গেছলো কলকাতায়, সেখানেই ফট্ হয়ে গেলো। কলকাতাতে মরে—সমুদ্রেও মরে মানুষ। ও একই কথা। তাই সাগরেই যেছি। বড় টানে গো! ওই নীল দরিয়ার ঢেউ, সকালের সাঁঝের গাং, রাতের তারা-জ্বলা সমুদ্র—

—হেই কিশোরী—ই! কাছি তোল্।

গোণের সময় হয়ে আছে। ওরা নৌকা ছাড়ছে। কিশোরী বলে,

—যাই গো দিদিমণি!

ছেলেটা দৌড়লো নৌকার দিকে।

লাফ দিয়ে উঠেছে। ঢেউয়ে দুলছে নৌকাটা—ঢেউয়ের সীমানা পার হয়ে দূর গাঙে চলে গেল নৌকাগুলো কিশোরীকে নিয়ে।

ওই দামাল ছেলেটা যেন সমুদ্রের ডাক শুনেছে, তাই এই মাটির পৃথিবীর চেয়ে ওর চোখে স্বপ্ন আনে সমুদ্রের নীল বিস্তার। সহরের মোহ ছেড়ে সে সেই অজানায় কিসের হাতছানিতে ফেরার হয়ে গেল!

…দূরে সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে।

কখন সূর্য ডুবে গেছে। মেঘের বুকে শেষ রঙের লুকোচুরি খেলা সেরে আঁধার নামছে।

দূর সমুদ্রে সেই কালো বিন্দুর মতো নৌকাগুলোকে আর দেখা যাচ্ছে না। মিলিয়ে গেছে দূর সীমান্তে।

সমর বলে—ওদের রাখতে পারবে না মিনু, সমুদ্রের টানে ওরা

হারিয়ে যাবে। ওই সমুদ্রেই একদিন ফেরার হয়ে যাবে হয়তো, আর ফিরবে না!

এমনি করেই ওরা হারিয়ে যায়!

সন্ধ্যা নামছে দীঘার সমুদ্র-সৈকতে। নীল মার্কারি আলোগুলো জ্বলে ওঠে। ঝাউবনে তার আভা পড়েছে। বাঁধে—বেলাভূমিতে তখনও যাত্রীদেব ভিড় রয়েছে। কলরব ওঠে। মুড়ি-চা-তেলেভাজার দোকানীদেব জমাট আসর চলেছে। বসেছে শঙ্খ, ঝিনুক, মাদুর-ওয়ালাদের দল বেসাতি সাজিয়ে।

দূরে সৈকতাবাসেব পিছনের ঝাউবন-ঢাকা সুন্দর টিলার উপর শ্বেতপাথরের জাফরি-ঘেবা ঠাঁইটায় নীলাভ আলো জ্বলছে। স্তব্ধ সবুজ নির্জনে ওই আলোটা জ্বলে।

মিনতি বলে—ওই সমাধিব ওখানে যাইনি কোনদিন। চলো ওখানে। দাঘাব এসে দীঘায় ওই মানুষটিকে কেউ স্মরণ করে না। অথচ শুনেছি উনি নাকি বিদেশী হয়েও দীঘার সমুদ্র-সৈকতকে ভালোবেসেছিলেন। জীবনের শেষদিনও কাটিয়েছেন এখানে, এখানেই রয়ে গেছে তাঁর নশ্বব দেহ।

সমব আর মিনতি এগিয়ে চলে ওই নির্জন ঠাঁইটার দিকে।

গেটটা খোলা। বালিযাড়িব একটা ছোট টিলামতো। পথটা উঠে গেছে উপবেব সুন্দব বাংলোব দিকে। আজ সেই বাংলোয় আগেকার মতো ভ্রমণার্থী কেরানীকুলের কাচ্চা-বাচ্চার কলবর নেই। তারা সপরিবারে ফিবে গেছে দীঘা দর্শন করে। আবার শান্তি নেমেছে ঠাঁইটায়।

চৌকিদারেব ঘব প্রধান বাংলোটা থেকে দূরে। বিরাট বিস্তীর্ণ এলাকা। উঁচু-নীচু বালির পাহাড়। চড়াইয়ের বুকে দীঘল ঝাউবন। ওদিকে একটা পুকুর দেখা যায় বালিয়াড়ির নীচে। ঝাউবনের ফাঁক দিয়ে আলো-জ্বলা দীঘার পথ—লোকজনের ভিড়, বাসের আনাগোনা দেখা যায়।

এখানে কোন গোলমাল কলরব নেই।

স্তব্ধ প্রশান্তি বিরাজমান।

বিদেশী এই ইংরেজনন্দন ইংল্যাণ্ডের কোন অঞ্চল থেকে বাণিজ্য করতে এসেছিলেন কলকাতায়। সোনা-রূপো; মণিমুক্তার জহুরি। তখনকার দিনে বাংলাদেশ, তথা ভারতবর্ষ ছিল অসংখ্য রাজা-রাজড়া, ছোট-বড় জমিদারের দেশ। তাদের অর্থের অভাব ছিল না।

তাই বিদেশী এই ব্যবসায়ী এখানে জমিয়ে বসেছিলেন। তখনকার দিনে হ্যামিলটন কোম্পানীর নাম ছিল সুপরিচিত।

অর্থই শুধু রোজকার করেননি এই বিদেশী, মনের অতলে অন্তমনে ছিলেন সৌন্দর্য-পিয়াসী। তাই তিনি সময় সময়ে বের হয়ে পড়তেন দূর-দূরান্তরে—এখানের প্রকৃতি, দেশ আর মানুষকে কাছে থেকে দেখার জন্য।

সেইরকম একটি পরিক্রমায় ঘোড়ার পিঠে দীর্ঘপথ পার হয়ে ক্লান্ত মানুষটি দীঘার সমুদ্র-সৈকতে এসে পড়েছিলেন। তার আগে কাছাকাছি এসেছিলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও। তিনি কাঁথিতে থাকাকালীন এখানের সমুদ্রতীরের, অরণ্যাণীর পট-ভূমিকায় লিখে-ছিলেন কপালকুণ্ডলা।

সেই বিদেশী দীর্ঘপথ পার হয়ে এসে এখানের বেলাভূমি, রূপালী বালিয়াড়ির পাহাড়ে ঘনসবুজ ঝাউবনের রূপ, নীলসমুদ্রকে দেখে নির্জন এই অঞ্চলকে ভালোবেসে ফেলেন।

তারপর থেকে প্রায়ই আসতেন এখানে সময় পেলে।

তখন এদিক প্রায় জনশূন্য। বালিয়াড়ির দাবীদারও বিশেষ ছিল না। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তিনি জায়গা নিয়ে এখানে বাংলো গড়ে তুললেন। গাছগাছালি লাগিয়ে তৈরী হল সবুজ বাগান।

বাংলোকে সাজালেন মনোমতো করে।

…ক্রমশ যাতায়াতের পথ গড়ে উঠলো কাঁথি সহর থেকে।

বাস চালু হলো। কিছু মানুষ খড়গপুর থেকে দিনান্তে দুখানা বাসে করে আসতে লাগলো।

এই বিদেশীকে শ্রদ্ধা করতেন ডাঃ বিধান রায়ও। তিনিও এলেন দীঘায়। বিদেশী সাহেবের নিজস্ব ছোট প্লেন ছিল। সেই প্লেন নামতো শনিবার দীঘার বীচে। ডাঃ রায়ও দীঘাকে দেখে ভালোবেসে-ছিলেন। তাঁর দূরদৃষ্টিতে দেখেছিলেন যন্ত্রসভ্যতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ চাইবে ক্ষণিকের মুক্তি, কিছু অবসর যাপন করতে শান্তিতে।

তিনিই দীঘাকে নোতুন করে সাজাবার পরিকল্পনা নিলেন। গড়ে উঠলো সৈকতাবাস এই টিলার নীচেই সমুদ্রেব ধার ঘেঁষে।

সেই বিদেশী তখন বৃদ্ধ, ব্যবসা থেকে অবসর নিয়েছেন কিন্তু অন্য ইংরেজদের মতো ভারতে লুটপাট করে সম্পদ জমিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে আরাম করেননি। তিনি আর দেশেই ফিরলেন না। কাজ থেকে অবসর নিয়ে ফিরে এলেন দীঘায় তাঁর গড়া এই সবুজ বন ঘেরা বাংলোয়।

টিলার উপবের বাংলোর সামনে বাগানে বসে থাকতেন অসীম সমুদ্রের দিকে চেয়ে।

...মিনতি দেখছে এখান থেকে অর্ধচন্দ্রাকারে ছড়ানো বিস্তীর্ণ— পূর্ণিমার চাঁদেব আলোভরা—মত্ত জোয়ারভরা সমুদ্রকে। টিলার নীচে সৈকতাবাসের নীচু ছাদ ছাপিয়ে ঝাউবনের মাথা ছাড়িয়ে দেখা যায় দিগন্তপ্রসারী সমুদ্র-সীমা।

এ এক অপরূপ দৃশ্য। সমুদ্রের অপরূপ রূপ যেন নোতুন করে দেখছে সে। দেখছে ঢেউয়ের মাথায় আদিগন্ত প্রসারিত তারাফুল ছড়ানো সমুদ্রকে।

মিনতি বলে—এখান থেকে সমুদ্রের রূপ সত্যিই সুন্দর। বোধহয় সব থেকে ভালো দেখা যায় সমুদ্রকে। বিদেশী ভদ্রলোক কিন্তু বেস্ট ভিউ দেখেই বাংলো বানিয়েছিলেন।

সমর বলে—তা সত্যি। আর সে' বায় তাই টিলার নীচে সৈকতা-বাসকে দোতালার বেশী তুলতে দেননি। অন্তত যতদিন সেই বিদেশী বৃদ্ধ বেঁচে থাকবেন, তিনি যাতে সমুদ্রকে দেখতে পান এখান থেকে।

মনে হয় আজও যেন তিনি বেঁচে আছেন!

বাংলোর সামনে মার্বেলপাথরের সুন্দর জাফরি ঘেরা তাঁর সমাধি,

সমুদ্রের রূপ এখানে অবারিত, বাতাসে ওঠে সমুদ্রের কলকল্লোল, অন্তহীন স্তব্ধতার মাঝে মুক্ত আকাশের নীচে সেই দীঘাপ্রেমী বিদেশী আজ সমাহিত।

আজও যেন এখান থেকেই সমুদ্রের দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ, চির-নিদ্রিত তিনি এই বেলাভূমির টিলার কলকল্লোল সুরজগতে।

মিনতি বলে—জায়গাটাকে ওরা এইভাবেই রাখলে পারতো। এখানে হলিডে হোম করে দখল করাটা কেমন বেমানান ঠেকে।

সমরও শুনছে কথাটা।

রাত্রি নামে। মার্কারী আলোটা জ্বলছে, সমাধি-বেদীর উপর পড়েছে নরম আলোর আভা। এদিক-ওদিকে ছড়ানো গাঁদাফুলের বাগান থেকে কতকগুলো ফুল তুলে শ্বেতপাথরের সমাধির উপর ছড়িয়ে, মিনতি নমস্কার জানায়।

ওটি যেন দীঘাতীর্থের অলক্ষ্য তীর্থদেবতাই।

আজকের মানুষ ওকে চেনে না। চেনার দরকারও বোধ করে না। তারা দীঘায় আসে দুদিনের আনন্দ উপভোগ করতে নগদ মূল্য দিয়ে এই মাত্র।

ওই স্তব্ধ আলোআঁধার ভরা পথ পার হয়ে, সমর-মিনতি ফিরছে বাইরের দিকে। বালিয়াড়ি, ঝাউবন, পাশের ঝিলের জলে চাঁদের আলোর আলপনা আঁকা। এই জগতে আলোর বাহার ও কলরব নেই; দীঘার অতীত রূপের যেন কিছুটা আভাষ এখানে মেলে।

বাইরের পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা।

চাঁদের আলোর স্বপ্ন মুছে গেছে বিজলীর আলোয়। বাসগুলো হর্ন দিয়ে আসা-যাওয়া করে।

ভ্রমণার্থীদের ভিড় জমেছে বীচে, বাজারে, বিভিন্ন দোকানের সামনে।

ভবতারিণীকে দেখে চাইল ওরা।

মিনতি বলে—একাই বের হয়েছো মা?

ভবতারিণীর হাতের ব্যাগে কি-সব জিনিসপত্র। মাতুরের আসন, ঝিনুকের তৈরী টুকিটাকি। মিনতি বলে,

—ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। এখানেও এইসব কিনতে বের হয়েছো? কলকাতায় কি এসব মেলেনা?

ভবতারিণী হাসে। বলে সে,

—তবু চিহ্ন কিছু নিয়ে যাই রে; আর আসনগুলো দামেও সস্তা। বাবা সমর, একটা শাঁখের দর করলাম—তুমি একটু দ্যাখোনা যদি কমসম কিছু করে।

সমর আজ এদেরই একজন। বলে সে,

—চলুন, দেখিগে।

মিনতি সেই তুপুর থেকে ঘুরছে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। বলে,

—এখনও শাঁখ কিনতে হবে?

ভবতারিণী বলে—পুড়ে, আগ্রা, ঘর করতে ওসব লাগে। তুই কি বুঝবি? শাঁখটা নিয়েই আমি ফিরে যাচ্ছি।

কথাটা মনে করিয়ে দেয় ভবতারিণী।

—রাতে আমি তুধ-মিষ্টি খেয়ে নেব। ঘরে আছে। এবেলা রান্নার পাট করিনি। বাইরে খেয়ে নিবি তোরা।

ভবতারিণী শাঁখের দোকানে এসেছে।

দোকানদার শাঁখা তুলে ফুঁ দিয়ে চলেছে। নিটোল শব্দ ওঠে, একটানা শব্দ বের হয় ওই ছোট শাঁখ থেকে। যেন সমুদ্রের সুর বাজে ওতে।

এতকাল সমুদ্রে বাস করেছিল জীবটা।

তার দেহের পরমাণুতে সমুদ্র মিশিয়ে আছে, তাই ওর বুকে ফুঁ দিয়ে মানুষ শোনে দূর সমুদ্রের সাড়া!

সমর শাঁখটা কিনে ফেলে।

ভবতারিণী দাম দিতে গিয়ে অবাক হয়।

—তুমিই দিয়েছো?

হাসে সমর—থাক্ এটা।

মিনতি হাসিভরা স্বরে বলে,

—দেখছো না ঘুষ দিচ্ছে তোমায় ? নাও না, বাপু !

ভবতারিণী ধমকে ওঠে—থাম্ তো তুই। যতসব আজেবাজে কথা তোর! হ্যাঁরে, ভুলে গেলাম, সেই কিশোরীর বাড়িতে গেলি—পাত্তা পেলি তার ?

মিনতির মনে পড়ে ব্যাপারটা।

সেও ভুলে গেছল। এবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সমুদ্রযাত্রার সেই ছবিটা। নোতুন ধুতি গেঞ্জি পরে খুশিমনে আবার সমুদ্রে চলেছে কিশোরী কিসের ডাক শুনে !

সমুদ্র ডাকে ! তার বিশাল রূপজগতের সন্ধান পেয়েছে ওরা।

সেই ঢেউ—দিগন্তজোড়া বিস্তারে ওরা বিন্দুর মতো হারিয়ে গিয়েই ধন্য হয়।

মিনতি বলে—সে আসবে না, মা। ছেলেটা ওর মাকে কাঁদিয়ে আবার সমুদ্রে পালিয়েছে।

—সেকি রে! ভবতারিণী অবাক হয়।

ওরা জানে না সেই আকর্ষণ কত দুর্বার।

মিনতি বলে—তুমি যাও। খেয়েই ফিরছি।

ভবতারিণীর খেয়াল হয়। বলে সে,

—তাই আয়, বাছা। দেরী করিস না। ভোরেই বাস।

সমর জানায়—না, না। দেরী হবে না।

চাঁদনী রাতের দীঘা।

জন-কোলাহল কমে আসছে। ভ্রমণার্থীরা যে যার আশ্রয়ে ফিরছে। মিনতি-সমরও খাওয়া সেরে বীচে এসে দাঁড়িয়েছে। ঝাউবনে ওঠে মর্মর, ঢেউয়ের শব্দ মিশেছে বনমর্মরে।

রাতের নির্জন সমুদ্রতীরে মিনতি বলে,

—এখানে এসে অনেক কিছু পেয়েছি, সমর। সমুদ্র দেয় অনেক কিছু !

সমর চাইল মিনতির দিকে।

তার শূন্য নিঃসঙ্গ জীবনও আজ পূর্ণ হয়ে উঠেছে কি পরম পাওয়ার প্রসাদে!

মিনতির হাতখানা ওর হাতে।

এই স্পর্শ টুকু তার মনে ঝড় তুলেছে। নির্জন সমুদ্রের গর্জনে ওঠে মহাকালের কলরোল।

মনে পড়ে ওদের আসার দিনটির কথা।

বাসের বিচিত্র মানুষগুলো এসেছিল। সেই ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যেও দেখেছে কি নাটকীয়তা!

সেই মাছের ব্যবসাদার নিমাই, তার স্ত্রীর কথা মনে পড়ে।

সীমা সব ফেলে চলে গেছে আশ্রমের জীবনে। ঘরে ফিরে গেছে নিমাই শূন্যহাতে। তার মত্তপ লালসা-মাখানো বিকৃত রূপটাকে দেখেছে মিনতি।

দেখেছিল সীমার পূত-পবিত্র রূপটিকে।

হরিপদ সরকারের জীবনেও অনেক হিসাব, জমাবন্দী অভ্যাসও ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। ছোট ঘরে একজনকে তৃপ্তির অবকাশটুকুতে নিশ্চিন্তে পেতে চায় সে জীবনের শেষ পর্বে এসে।

মনে পড়ে কাজলের কথা।

মিনতি তাকেও চিনেছিল। লাজুক মেয়েটি বাঁচার স্বপ্ন দেখেছিল, একটা চাকরীর স্বপ্ন। ভালোবাসা -ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখা দূরের কথা, সে শুধুমাত্র নিজের মানসম্মান নিয়ে খেটে, খেয়ে প'রে বাচতে চেয়েছিল। কিন্তু তাও পায়নি।

কি নিদারুণ ব্যর্থতার পরিণতি হিসাবে শেষ হয়ে গেছে মেয়েটি! ও আর কোনদিনই কলকাতায় ফিরবে না।

...এমনি অনেকে এসেছে। কেউ পেয়েছে কিছু, কেউ ফিরে গেছে শূন্যহাতে। মহাকালের তীরে দু'দিনের ঘর বাঁধা! ভালোবাসার স্বপ্ন নিয়ে আজ ফিরে যাবে মিনতিও।

সমরের কথায় চাইল।

—রাত হয়েছে। চলো—

দীঘার শেষ চাঁদের আলোভরা সমুদ্র, বালুচর-ঝাউবনকে দেখে নেয় মিনতি। বলে—সুন্দর জায়গা। আবার আসবো কিন্তু।

জীবনের স্বপ্নগুলো সুন্দরই।

মানুষ তাই যেন বারবার সেগুলোকে ফিরে পেতে চায়, দেখতে চায়। কিন্তু কঠিন বাস্তবের সামনে তারা অনেক সময় অদেখাই থেকে যায়।

ফিরছে ওরা।

সকালের প্রথম আলোর রংবাহার ছড়িয়ে পড়েছে আকাশ-সমুদ্রে।

বাসটা ছাড়বে এবার।

ভবতারিণী মালপত্র দেখেশুনে নেয়। মিনতি-সমরই গোছগাছ করে ওকে সিটে বসালো।

সকালে বীচে বের হয়েছে নোতুন ভ্রমণার্থীর দল। বাস-বোঝাই নোতুন খুশীভরা মন নিয়ে আবার অন্য দল আসছে। এখানে ছুটির মেজাজ, খুশীর সুর, মুক্তির আলো।

এই নিয়ে দীঘা চির-আনন্দের হাট বসিয়েছে।

সেই আনন্দের জগৎ থেকে মিনতি-সমররা ফিরছে আবার কলকাতার দিকে। বাসে রয়েছে অনেক দীঘা-ফেরত যাত্রিদল। নোতুন মুখও। খুশির কলরব ওঠে না। ওরা ফিরছে কাজের জগতে। বাচার লড়াইয়ে আবার সামিল হতে।

তবু মিনতির মনে সুর ওঠে।

বিচিত্র একটি স্বপ্নের রং জাগে : সমরের দিকে চাইল।

আজ ওরা তুজনে যেন জীবনের একটি মধুর অনুভূতির স্পর্শ পেয়েছে।

দীঘার ঝাউবন বালিয়াড়ি পিছনে ফেলে লাক্সারী-বাস এগিয়ে চলেছে শহর কলকাতার দিকে।

—